তখন দ্বিপ্রহর। খাঁ খাঁ করছে চতুর্দিক।

শহরের এক প্রান্তে এসে পৌঁছলেন কালিয়ারের কুতুব। কোন্ দিকে এগোবেন, স্থির করতে পারলেন না তিনি।

এ দিকটায় লোক চলাচল তেমন নেই। প্রখর রোদের তেজে মাটি তেতে উঠেছে। এ সময় পথে লোকজন না থাকারই কথা। মনে হয় শহরের অভ্যন্তরেও এ সময় লোক চলাচল তেমন একটা থাকে না।

কাছেই একটা ডুমুর গাছ। গাছের শীতল ছায়া যেনো নীরবে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দূরাগত পরিশ্রান্ত মুসাফির সে ডাকে সাড়া দিলেন সহজেই। দীর্ঘ পথ-পরিভ্রমণের শ্রান্তি শরীরে। এবার একটু জিরিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

ডুমুর গাছের নিচে বসে পড়লেন তিনি। সামনে সুসজ্জিত শহর কালিয়ার। এই শহরেরই নির্বাচিত কুতুব তিনি। কুতুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করবার জন্যই এতদূর পর্যন্ত এসেছেন। এসেছেন পীর ও মোর্শেদ হজরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র. এর নির্দেশে। সেই সুদূর পাক পট্টন থেকে।

পীর ও মোর্শেদের নির্দেশ, কালিয়ারের বেলায়েতের দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হবে। শহরের অধিবাসীরা অধিকাংশই হয়েছে ভ্রষ্টপথানুগামী। তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করতে হবে। আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সবাইকে দ্বীন ইসলামের জ্যোতির্ময় জগতে। বেদাত কুফরির কালো মেঘ সরিয়ে আবার আনতে হবে হেদায়েতের পূর্ণ সূর্যোদয়। কি কঠিন দায়িত্ব।

বেলা পড়ে এলো। মধ্যাহ্নের খরতাপ কমে এলো অনেক। পথে লোকজনের চলাচলও শুরু হলো কিছু কিছু করে।

ডুমুর গাছের পাশ দিয়ে পথ। সেই পথ ধরে শহরের দিকে কেউ যাচ্ছে। কেউ আসছে। এভাবেই যাওয়া আসা করে মানুষ। কেউ যায়। কেউ আসে। জীবনের

পথে এভাবেই নিয়মিত মানুষের যাওয়া আসার বিবরণ নিয়ে গড়ে ওঠে মহামানুষের মহাসভ্যতার ইতিহাস।

পথচারীদের কেউ কেউ তাকায় ডুমুর গাছের দিকে। তেমন বিস্ময়বোধ করে না কেউ। অতি সাধারণ পরিচ্ছদাবৃত মানুষ কিনা– তাই কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না তেমন। কেউ চোখ তুলে তাকায়ও না। কেউবা যদিও তাকায়, ক্ষণকাল পরেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গন্তব্য পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

কেউ প্রশ্ন করে না, পরিশ্রান্ত পথিক, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো? যাবেই বা কোথায়?

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। কতো লোক এলো। গেলো। তিনিও কাউকে শুধালেন না কোনো কিছু। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সবাইকে। মানুষগুলোর জন্য মায়া হয়। বুকের মধ্যে দরদ উথলে ওঠে। মনে হয় সবাই আপন। বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয় সবাইকে। অন্তরের অন্যপিঠে ওঠে নিঃশব্দ আওয়াজ- "তোমরা তো আমারই লোক। হে কালিয়ারের অধিবাসীবৃন্দ। আমিই তোমাদের অন্তরের অমাধ্বংসী আপন আত্মীয়। তোমাদের অন্তরের অন্ধকার গলিতে আলো জ্বালাতে এসেছি আমি। আল্লাহ্ প্রেমের অবিনশ্বর আলো। কালিয়ারের কুতুব আমি। তোমাদের প্রকৃত বন্ধুজন।"

এভাবেই কেটে গেলো তিন দিন।

রাতে শহরের কোলাহল থেমে যায়। আকাশে জেগে থাকে নক্ষত্রের নিষ্পলক নয়ন। বাতাস শীতল হয়। শীতলতর হয়। দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয় এক সময়। নীরব নিসর্গের মাঝে মিশে একাকার হয়ে যান মুসাফির। জিকিরে রত হয় আকাশ। পৃথিবী। ডুমুর গাছের নিচে গভীর মগ্নতায় ডুবে নবনিযুক্ত কুতুবও সমর্পিত হন এবাদতে।

আবার সকাল হয়। কর্মচাঞ্চল্যে জেগে ওঠে পৃথিবী। কালিয়ারের পথে শুরু হয় মানুষের আনাগোনা। যায় আসে সবাই। নবাগত পথিকের প্রতি কৌতূহলী হয় না কেউই।

এভাবেই কেটে যায় তিন তিনটে দিন। বৃদ্ধা গুলজারী বেগম কিন্তু ব্যাপারটা নীরবে লক্ষ্য করে আসছিলেন। ডুমুর গাছের নিচে উপবিষ্ট কে এই পথিক? এই স্থানে

একইভাবে তিনি বসে থাকেন কেনো? অন্তর সাক্ষী দেয়, খাঁটি দরবেশ ইনি। নাহলে অকারণে এক স্থানে তিনি বসে থাকবেন কেনো? কী সুন্দর সৌম্যশান্ত পবিত্র মুখমণ্ডল। আপনা আপনি বেড়ে ওঠা সবুজ বনরাজির মতো। অগোছালো। কিন্তু সুন্দর।

মন সাক্ষী দেয়, ইনি বরহক অলিআল্লাহ্। গৃহহীন আশ্রয়হীন পথিক দরবেশ। মনে হয় অভুক্তও।

গুলজারী বেগম ভাবেন, দূরদেশী এই আল্লাহপ্রেমিক পথিককে কী ভাবে সম্মান প্রদর্শন করা যায়? হাদিয়া হিসেবে কিছু আহার্য বস্তু পাঠানো প্রয়োজন তাঁর সামনে। কিন্তু তিনি যে উপায়হীনা। বিধবা মানুষ। কখনো আহার জোটে। কখনো জোটে না। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি ব্যাপারটা পাশের বাড়ীর সৎ প্রতিবেশী জামালউদ্দিনের ছেলে বাহাউদ্দিনের মাধ্যমে কিছু সুস্বাদু আহার্য পৌঁছে দিলেন ডুমুর বৃক্ষের ছায়াবাসী পথিকের খেদমতে।

হাদিয়া কবুল করলেন তিনি। অন্তরের অঙ্গন উপচে আপনা আপনি প্রবাহিত হলো দোয়ার পবিত্র প্রস্রবণ।

এভাবেই নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠিত হলো কালিয়ারের কালজয়ী কুতুবের। শুরু এখানেই কিন্তু শেষ কোথায় কীভাবে কে জানে?

কালিয়ার ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কৃষ্ণলীলার প্রসিদ্ধ পাদপীঠ। সারা শহর জুড়ে ছিলো শত শত মন্দির। সে সব মন্দিরের সেবায় নিয়োজিত ছিলো হাজার হাজার পুরোহিত। কুফরি আধ্যাত্মিক সাধনায় তাদের ছিলো যথেষ্ট অধিকার। নগ্ন প্রেমলীলার নানা উপাখ্যানের ঐতিহ্য নিয়ে ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরের এই প্রাচীন জনপদটি পরিণত হয়েছিলো সুবিশাল শহরে।

প্রথম শহর প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন রাজা করমপাল। তখন এর নাম ছিলো হরদেও। পরবর্তী সময়ে অধস্তন বংশধর রাজা কল্যাণ পার শহরের নাম রাখেন কালিয়ার।

হজরত গরীবে নেওয়াজ খাজা মইনুদ্দিন চিশতী র. এর সময়ে যখন ভারত উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে মুসলমান অলিদরবেশগণের আগমন শুরু হয়, তখন থেকেই কালিয়ারে মুসলিম জনবসতির প্রতিষ্ঠা চলতে থাকে। এক সময় গরীবে

নেওয়াজ এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হজরত কামাল আহমদ বাগদাদী র. কালিয়ার এসে পৌঁছেন। কালিয়ারের পৌত্তলিক সংস্কৃতির শান শওকত দেখে বিস্মিত হন তিনি। শহরবাসী সবাই হিন্দু। মুসলমান জনতার নামগন্ধ কোথাও নেই। চেষ্টা করেও কোনো মুসলমান এখানে অবস্থান করতে সক্ষম হননি। তীব্র মুসলিমবিদ্বেষ ছিলো এখানকার মানুষের মনে। তারা মুসলমান মুসাফিরদের কাফেলা লুঠ করে। তাদেরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে।

যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হিন্দু যোগীরাও তাদের যাদুক্রিয়া দ্বারা উত্যক্ত করে মুসলমান মুসাফির ফকির দরবেশদেরকে।

আজমীরে উপস্থিত হয়ে এসব ঘটনা হজরত গরীবে নেওয়াজ খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর নিকট আদ্যপান্ত বর্ণনা করলেন হজরত কামাল বোগদাদী। সব শুনে মজলুম জনতার একান্ত বন্ধু খাজা গরীবে নেওয়াজ ভাবলেন, এর একটা বিহিত করতেই হবে। কালিয়ারবাসীদের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে বলপ্রয়োগও করতে হবে। তাদের অপরাধের শাস্তিবিধান করাও জরুরী।

দিল্লীর বাদশাহ্ তখন কুতুবুদ্দিন আইবেক। বাদশাহ্ কুতুবুদ্দিন চিশতীয়া তরিকার একনিষ্ঠ ভক্ত ও মুরিদ। তাঁর দরবারে পত্র মারফত ঘটনা বর্ণনা করে এর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন হজরত খাজা আজমিরী র.। পত্রবাহক নির্বাচিত হলেন হজরত খাজার প্রিয় খলিফা হজরত সৈয়দ ইমামুদ্দিন আবু সালেহ্ র.।

হজরত আবু সালেহ্ এর মাধ্যমে পীর মোর্শেদের পত্র পেয়ে বাদশাহ কুতুবুদ্দিন তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সেনাপতি কেয়ামুদ্দিন জামোয়ানকে তলব করলেন তিনি। নির্দেশ দিলেন, সেনাবাহিনী প্রস্তুত করুন। আগামীকালই কালিয়ার যাত্রা করতে হবে।

পরদিন বিশাল সেনাবাহিনী রওয়ানা হয়ে গেলো কালিয়ারের পথে। সেনাবাহিনীর সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হলেন হজরত আবু সালেহ্ র.। তিনিই এই অভিযানের নেতৃত্বদানের জন্য একান্ত উপযুক্ত। কারণ, এতো শুধুই যুদ্ধযাত্রা নয়। এই বাহিনীর কাজ হবে মানবতার একমাত্র আশ্রয়স্থল দ্বীন ইসলামের প্রতি উদাত্ত আহবান জানানো। কালিয়ারবাসীরা যদি আহবানে সাড়া দেয়, তবে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজনই নেই। কিন্তু তারা যদি আহবান প্রত্যাখ্যান করে উল্টো আক্রমণ করে বসে, তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রতিআক্রমণ তো করতেই হবে। সমুচিত শাস্তি বিধান করতে হবে তাদের ধৃষ্টতার। তাই অলি আল্লাহ্ সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে মুসলিম সেনাবাহিনী এগিয়ে চললো কালিয়ার অভিমুখে।

শহরের সন্নিকটে পৌঁছে মুসলিম সৈন্যদল অবস্থান গ্রহণ করলো। মুহূর্তে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সারা কালিয়ারে। ভয়ে আত্মগোপন করলো মন্দিরাশ্রয়ী পুরোহিতের দল। শংকিত হলো সাধারণ জনতা। কিন্তু ক্ষত্রিয় হিন্দুরাজ আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইলো যেনো। সত্যের আহবান সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করলো রাজা। এতো বড়ো সাহস ম্লেচ্ছ যবন সম্প্রদায়ের! ধর্মান্তরের আহবান জানায় তারা।

সুশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রাজা ঝাঁপিয়ে পড়লো যুদ্ধক্ষেত্রে। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। কচুকাটা হতে লাগলো হিন্দু সেনারা। মুসলিম পক্ষেরও অনেকে পান করলেন শাহাদাতের শারাবান তহুরা।

যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন হঠাৎ শত্রুসৈন্যের একটি তীর এসে হজরত আবু সালেহ্‌র বক্ষে বিদ্ধ হলো। জমিনে পড়ে গেলেন তিনি। অল্পক্ষণ পরেই লাভ করলেন আকাংখিত শহীদের মর্যাদা।

হিন্দুরা ভেবেছিলো সেনাপতির মৃত্যুতে মুসলিম সৈন্য হতোদ্যম হয়ে পড়বে। কিন্তু আশা সফল হলো না। পরাজিত হলো হিন্দু বাহিনী। নিহত হলো কালিয়ারের রাজা।

কালিয়ার করায়ত্ব হলো মুসলমানদের। নির্মিত হলো নতুন মসজিদ। মসজিদের মিনারে ধ্বনিত হলো প্রেমিকজনের কাংখিত আহবান, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর- আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ মহান। কেঁপে উঠলো কালিয়ার। নত হলো কুফর ইসলামের কাছে।

একসময় মুসলিম সেনাবাহিনী ফিরে গেলো রাজধানী দিল্লীতে। তারপরে সুযোগ বুঝে পরাজিত পুরোহিতরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো ক্রমে ক্রমে। কালিয়ারের আশে পাশে ধীরে ধীরে একত্রিত হলো পুরোহিতদল।

এদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো গোত্রগত কোন্দল। বাতিলপন্থি ইসলামিয়া সম্প্রদায় তখন ছিলো কালিয়ারের শীর্ষস্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক প্রভাবের নিকট নতি স্বীকার করলো তারা। তারা তাদের ইমামকে মনে করতে লাগলো বিষ্ণুর প্রতীক হিসাবে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির সামনে তারা হিন্দুদের দশ অবতারের নাম পাঠের প্রথা প্রবর্তন করলো। দেয়ালী ও অন্যান্য পূজা পার্বনের সময় তারাও নিজেদের বাড়িতে আলোকসজ্জার ব্যবস্থাকে মেনে নিলো অবলীলাক্রমে। হিন্দু যোগীসাধকদের অলৌকিক কার্যকলাপকে তারা মনে করতে লাগলো সত্য কারামত বলে।

রইস কেয়ামউদ্দিন জামোয়ান ছিলো মুসলমান নামধারী এই অভিনব সম্প্রদায়ের ইমাম। খেয়ালখুশীমতো সে কাউকে বেহেশতী, আবার কাউকে

দোজখী বানিয়ে দিত। শহরের কাজীও ছিলো তার অপকর্মের সহযোগী। ক্রমে ক্রমে কালিয়ারের অধিকাংশ মুসলমানও অনুগামী হলো তাদের।

প্রায় শতাব্দীকালের বিবর্তনে মুসলমানদের অবস্থা যখন এ রকম জঘন্য রূপ ধারণ করেছে, তখন কালিয়ারে প্রেরিত হলেন নতুন কুতুব। কালিয়ারবাসীকে সত্যপথপ্রদর্শনের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন শহর কালিয়ারের দ্বারপ্রান্তে। ডুমুর গাছের নিচে বসে ভাবেন তিনি, এখন কীভাবে কাজ শুরু করবেন।

আল্লাহ্ আলেমুল গায়েবই ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ জ্ঞানধারী। কালাতীত তিনি। জ্ঞানাতীত। ধারণাতীতও। মানুষ তাঁর বান্দা ব্যতীত কিছু নয়। পৃথিবীর জীবনে কালের বৃত্তাধীন তারা। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মহাকালের বুক চিরে এগিয়ে চলে মানুষের প্রবহমান জীবনযাত্রা। শুধুই সম্মুখযাত্রা। কাল অতিক্রমণের নিরবচ্ছিন্ন অভিযাত্রার কোনো বিরতি নেই। ছেদ নেই।

তবু মানুষ ফিরে তাকায় পিছনের দিকে। পিছনের জমানো জীবনকে বার বার দেখে নেয় তারা। স্মৃতি মন্থন করে। অতীত থেকে আহরণ করে সুখ দুঃখের শত স্মৃতিস্নাত অভিজ্ঞতা। যন্ত্রণাদগ্ধ সুখ। অথবা আনন্দময় দুঃখ। অথবা অর্থহীন অর্থময় অন্য কোনোকিছু।

কালিয়ারের কুতুবের অতীতও অনেক সুখ দুঃখ সাধনার সম্ভারে পরিপূর্ণ। অন্তরের অঙ্গনে মুহূর্তেই বিম্বিত হয় অতীতের বিস্তীর্ণ পরিধি। জন্ম। জন্মস্থান। শৈশব। জান্নাতবাসিনী মা। বিশ্ববিখ্যাত আউলিয়া প্রিয়তম মোর্শেদ, হজরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র.। আরো কতো শত অপসৃয়মান ঘটনা। সে সমস্ত অতীত কি অনুল্লেখ্য কোনো কিছু? সে সমস্ত ইতিহাস কি বিস্মৃতির বুকে নিমজ্জিত হতে পারে কখনো?

কালিয়ারের কুতুব যে অনন্যসাধারণ মানবপ্রেমিক। ক্ষণজন্মা আউলিয়া। তাঁর রূহানী ফয়েজের জ্যোতি যে মানুষের প্রেমপিপাসিত মনের একান্ত আকাংখিত সম্পদ। মানব জীবনের থমকে যাওয়া ইতিহাসে তাই প্রশ্ন জাগে, কে এই কালিয়ারের কুতুব? কোথায় জন্ম? কোথায় জন্মস্থান? কোন নামে অভিহিত হন

তিনি? কোন সাধনার সিঁড়িপথ বেয়ে তিনি আজ উঠে এসেছেন কুতুবিয়াতের সিংহাসনে? সে প্রশ্নেরই জবাব আসছে সামনে।

জন্মজাত আউলিয়া ছিলেন তিনি। জন্মেছিলেন সৈয়দ বংশে। পিতার নাম সাইয়েদ আবদুর রহিম র.। হজরত আবদুর রহিম র. ৫৫৯ হিজরী সালের ৫ই জিলহজ্ব হেরাত শহরে আসেন। আল্লাহ্‌র পথের প্রকৃত প্রেমিক আবদুর রহিম একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হেরাতের বিশিষ্ট আউলিয়া শায়েখ মোহাম্মদ এছহাক র. এর খেদমতে নিয়োজিত হন।

এভাবেই কেটে যায় সুদীর্ঘ দশটি বছর। দীর্ঘ সোহবত ও খেদমতের মাধ্যমে তিনি জাহেরী ও বাতেনী এলেমে অর্জন করেন অগাধ বুৎপত্তি। তারপর পীর মোর্শেদের অনুমতিক্রমে তিনি আবার সফর এখতেয়ার করেন। এসে উপস্থিত হন মুলতান জেলার দিয়াপুর অঞ্চলের খোটোয়াল নামক স্থানে। সেখানে তিনি পরিচিত হন চিশতীয়া তরিকার বিখ্যাত বুজর্গ হজরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র. এর সঙ্গে। এক সময় তাঁর জ্ঞানে গুণে মুগ্ধ হয়ে হজরত গঞ্জেশকর তাঁর নিজের বোন হাজেরা র. এর সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। সেই প্রস্তাব অনুসারে একদিন অনাড়ম্বর পবিত্র এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। সেদিন ছিলো ৫৭১ হিজরীর ১৭ ই জমাদিউল আখের।

শুরু হয় সংসার জীবন। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই একনিষ্ঠ আল্লাহ প্রেমিক। দু'জনেই দুই শ্রেষ্ঠ বংশধারার অধস্তন পুরুষ ও নারী।

হজরত আবদুর রহিম ছিলেন হজরত মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানীর র. অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। হজরত পীরে দস্তগীর এর সঙ্গে এভাবে মিলেছে তাঁর বংশধারা– সৈয়দ আবদুর রহিম র.-সৈয়দ আবুদস সালাম-সৈয়দ মইনুদ্দিন-সৈয়দ আবদুল ওয়াহব-গাউসুল আজম হজরত আবদুল কাদের জীলানী র.।

হজরত হাজেরা র. ছিলেন পুতঃ পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী একজন অলিআল্লাহ্‌ মহিলা। তাঁর বংশধারাও নেমে এসেছে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মোমেনীন হজরত ওমর ফারুক রা. এর নিকট থেকে।

দীর্ঘ সংসারজীবন যাপনের পর এক সময় আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে খাস রহমত দান করলেন। দান করলেন এক কালজয়ী আউলিয়া সম্রাটকে। হিজরী ৫৯২

সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১৯ তারিখে বিবি হাজেরার কোল আলো করে জ্বলে ওঠলেন এক অনন্যসাধারণ সূর্য-সন্তান, আলী আহমদ। পূর্ণিমার চাঁদও তাঁর জ্যোতির কাছে হার মানে। ম্লান হয় কুসুমের রূপ।

নবজাতক জন্মগ্রহণ করবার পরপরই কেবলামুখী হলেন। মনে হয় কাবার প্রভুর উদ্দেশ্যে করলেন শোকরানার সেজদা।

এরপর ধাত্রী বুশরা বিনতে তাবরাক এগিয়ে এলেন শিশু আউলিয়াকে গোসল করানোর জন্য। কিন্তু শিশুকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা শরীর যেনো জ্বলে যেতে লাগলো। ভীত হয়ে দূরে সরে গেলেন ধাত্রী। অবস্থাদৃষ্টে ধাত্রীকে ভর্ৎসনা করলেন বিবি হাজেরা র., গাউসুল আজমের বংশধর এই শিশু। তুমি তাকে বিনা অজুতে স্পর্শ করেছো মনে হয়। তওবা করো। খবরদার আর কখনো বিনা অজুতে এই সম্মানিত শিশুকে স্পর্শ করো না।

এরপর একে একে প্রকাশিত হলো আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা। কয়েকদিন ধরে দুধপান করলেন না শিশু আলী আহমদ। এদিকে মাতার স্তন দুধের ভারে ফুলে ফেঁপে ওঠে। কষ্ট পান মা হাজেরা বিবি। পিতা আবদুর রহিম র. ভেবে পান না, কি করবেন। একদিন কি মনে করে তিনি বিবি হাজেরার স্তনে গাউসুল আজম র. এর নাম পড়ে ফুঁ দিলেন। এরপর থেকে দুধপান শুরু করলেন আলী আহমদ। কিন্তু অবাক কাণ্ড। তিনি একদিন দুধপান করেন। আর একদিন বিরত থাকেন দুধপান থেকে। হজরত দাউদ আ. এর নিয়মে তিনি রোজা রাখতে থাকেন একদিন পর একদিন। এভাবেই দুই বছর পূর্ণ হলে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী আপনাআপনি তিনি দুধ পান করা ছেড়ে দেন।

এক সময় কথা ফুটলো শিশুর মুখে। সর্বপ্রথম তিনি উচ্চারণ করলেন পবিত্র বাক্য, লা মাওজুদা ইল্লাল্লহ্‌- আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো অস্তিত্ব নেই।

পবিত্র পুত্রের মুখে প্রথম বাক্য শুনে বিস্মিত হলেন পিতা আবদুর রহিম। বারেগাহে এলাহীর উদ্দেশ্যে সেজদা করলেন তিনি। সে সেজদার মাধ্যমে জানালেন অন্তর নিংড়ানো শোকরানা।

দুনিয়ার আলো-ছায়া-স্নেহ-মমতাবিজড়িত মাতাপিতার সতর্ক তত্ত্বাবধানের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগলেন আলী আহমদ। অবোধ শিশু তিনি। বেশীর ভাগ সময়ই কাটে তার নীরবে নিভৃতে। আপন মনে কখনো কখনো জিকির করেন, লা মাওজুদা ইল্লাল্লহ্‌...লা মওজুদা ইল্লাল্লহ্‌...

কখনো গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন বহুক্ষণ। জেগে কাটান প্রায় সমস্ত রাত্রি। কখনো আল্লাহ্‌প্রেমের সমুদ্রে নিমজ্জিত অবস্থায় তাঁর পবিত্র চেহারায় ভেসে ওঠে বিভিন্ন বর্ণ। কখনো লাল আগুনের মতো হয় চেহারা। কখনো বদনে ভাসে অন্য অনেক রঙ এর খেলা। এসময় কেউ তাকে স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা ধরে যায়

স্পর্শকারীর সমস্ত শরীরে। হালের গালবার প্রভাবে অদ্ভূত অদ্ভূত অবস্থা হয় তাঁর। কখনো প্রচণ্ড ফয়েজের প্রবাহে শিশু শরীরের উপর পড়ে অসহ্য চাপ। একাধারে মুখ দিয়ে তাঁর কফ নির্গত হতে থাকে।

তারপর স্বাভাবিকতার সীমানায় ফিরে এলে তিনি প্রশান্ত হন কিছুটা। মুখে উচ্চারণ করেন, শোকর আলহামদু-লিল্লাহ্।

সংসারে সুখ সয়না বেশীদিন। সুখের সীমিত অধ্যায় সহজেই শেষ হয়ে যায়। এক এক সংসারে এক এক রকম ভাবে সুখের পাতা উল্টে গিয়ে ভেসে ওঠে দুঃখের পৃষ্ঠা। জীবন-গ্রন্থের এইতো নিয়ম।

নবী অলিগণের জীবনে একথা অধিকতর সত্য। আল্লাহ্পাকই তাঁদেরকে দুঃখের ছবক পাঠের মাধ্যমে দান করেন চিরস্থায়ী সুখের নিশ্চিত সনদ।

তাঁর বয়স তখন পাঁচ। এই বয়সেই পিতৃহারা হলেন তিনি। কচিমনে এই প্রথম এঁকে নিতে হলো পিতৃবিয়োগের বেদনা। পিতা, পিতৃস্নেহ জীবনে কতোখানি প্রয়োজন, শিশু আউলিয়া তার গভীরতা পরিমাপ করতে ভুলে যান যেনো। মায়ের বিষণ্ন মুখ দেখে তাঁর সঠিক মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন তিনি।

অন্তরে কতো ভাষাহীন ব্যথার মুখরিত মিছিল। কিন্তু মুখ বাকহীন। প্রায় এক বছর কোনো বাক্যই উচ্চারিত হলো না তাঁর মুখ থেকে। এতিম আলী আহমদ সম্পূর্ণ মৌনতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন যেনো।

বয়ে চলে দিন। কেটে যায় রাত।

শিশু আউলিয়ার নাম ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। অনেক আউলিয়া দরবেশ এসে ভিড় করেন তাঁর কাছে। কেউ কেউ প্রতিদিন আসেন। স্নেহভরে তাঁরা চুম্বন করেন আলী আহমদের ললাটদেশ। সে স্পর্শের বরকতে তাদের সমস্ত অবয়ব জুড়ে যেনো জারী হয় জান্নাতের পবিত্র সালসাবিল। অপূর্ব আবেশ। আল্লাহ্পাক কতো মেহেরবান এই শিশুর প্রতি। তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে যেনো অনির্বাণ জ্বলছে আল্লাহ্ প্রেমের অদৃশ্য শামাদান। তাঁর ছোঁয়ায় লৌহনির্মিত অন্তর যেনো খাঁটি সোনা হয়ে যায় নিমেষেই।

একদিকে উপায়হীন সংসার। মা হাজেরার জীবন যাপন চলে কষ্টেসৃষ্টে। কখনো অনাহারে। কখনো অর্ধাহারে।

কোরান শরীফ নকল করেন মা হাজেরা। পরিশ্রমের বিনিময়ে তা তুলে দেন লোকজনের হাতে। এভাবেই আয় হয় কিছু কিছু। কখনো হয়ওনা। সামান্য আয়ে কখনো আটা, কখনো যব কিনে এনে তাই দিয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করেন নিজের এবং শিশুপুত্রের।

একবার তিনদিন অনাহারে কাটলো তাঁদের। তিনদিন পর ফজরের নামাজ শেষে অনাহারী পুত্র হঠাৎ মায়ের নিকট বুক তোলপাড় করা আবদার জুড়ে দিলেন, মা। ক্ষুধা পেয়েছে যে খুব। খেতে দাওনা কিছু।

ক্ষুধার্ত পুত্রের আবদার শুনে মায়ের বুক ভেঙ্গে যায়। চোখ ফেটে নেমে আসতে চায় পানির প্রবাহ। পুত্রের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না তিনি। একেবারে নীরব হয়ে যান। অপেক্ষা করেন- আল্লাহ্পাক আহার যোগান কিনা। প্রহরকাল কেটে যায়। না। কারো দেখা নেই।

অভুক্ত শিশুপুত্রকে কি আর বলবেন তিনি। সান্ত্বনা দিতে চাইলেন তিনি বুকের মানিককে। উনুনে চড়িয়ে দিলেন পানিপূর্ণ একটি হাঁড়ি। জ্বাল দিতে লাগলেন উনুনে। ক্ষুধায় অস্থির সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আর একটু অপেক্ষা করো বাবা। এই হয়ে এলো বলে।

ক্ষুধার কষ্টে আরো অস্থির হয়ে উঠলেন আলী আহমদ। বললেন, আমি যে আর সহ্য করতে পারিনা মা। যা হয়েছে আমাকে তাই খেতে দাও। এই বলে উনুনের পাশে গিয়ে হাঁড়ির ঢাকনা তুললেন আলী আহমদ। তারপর উল্লসিত হয়ে বললেন, সুন্দর ভাত পাক হয়েছে যে।

মা-ও দেখলেন তাজ্জব হয়ে গেলেন, তাইতো। হাঁড়িতে ফুটছে সদ্যফোটা ভাত। চুলো থেকে ভাত নামিয়ে ছেলেকে খেতে দিলেন তিনি। আল্লাহ্পাকের এই গায়েবী মদদ দেখে কৃতজ্ঞতায় অন্তর বিগলিত হয়ে গেলো মা হাজেরার।

আসে শৈশব। আসে শৈশবের স্বভাবজাত চপলতা-চঞ্চলতার আমন্ত্রণ। কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই আলী আহমদের। আল্লাহ্ প্রেমের মত্ততামগ্ন ভাবোন্মাদনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় তাঁর দিনের রাতের অধিকাংশ সময়। আচরণে প্রতিফলিত হয় আল্লাহপাকের জালালী শান। আল্লাহ্পাকের রুদ্র রোষের জ্যোতিচ্ছটায় ক্রমশঃ নিমজ্জিত হয় সমস্ত সত্তা। ধীরে ধীরে যেনো বিকশিত হতে

থাকে আল্লাহ্‌পাকের দুশমনবিনাশী এক প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখা। ক্রমশঃ এগিয়ে যান তিনি সেই ভয়াবহ ঘটনার মঞ্জিলের দিকে। যে মঞ্জিলের মধ্যে অপেক্ষা করছে আগুন। শুধু আগুন।

এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁরই ঊর্ধ্বতন সম্মানিত আধ্যাত্মিক পুরুষ, হজরত ইমাম জাফর সাদেক র.। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ কাশফুল গোয়ুবে তিনি লিপিবদ্ধও করেছিলেন এই কথা।

তিনি লিখেছিলেন– সেইরাত্রি ছিলো ১৪৮ হিজরীর ১৭ই রজব। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত এবং জিকির, ফিকির শেষে সামান্য সময়ের জন্য নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি। স্বপ্নে দেখলাম, আলমে মালাকুত থেকে আলমে জাবারুত গিয়ে পৌঁছেছি। নজরে এলো অতি মনোরম একটি বাগিচা। সে বাগিচায় অনেক ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। আউলিয়া কেরামদের রূহ মোবারকও উপস্থিত ছিলো সেখানে। এমন সময় হাজির হলেন হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.। বললেন তিনি, এখানে এই মারওয়ারিদ নির্মিত তাঁবুতে হুজুরে আকরম স. তশরীফ এনেছেন। তিনি স. তলব করেছেন আপনাকে। একথা শোনামাত্র আমি হাজির হলাম তাঁবুর অভ্যন্তরে। আমাকে উদ্দেশ্য করে রসুলেপাক স. এরশাদ করলেন, 'বৎস! মাত্র তিনদিন পরে তুমি আমার নিকট স্থায়ীভাবে চলে আসবে। আমার ইচ্ছা আলমে জাবারুতের অবস্থা নিরীক্ষণ করে তুমি তা আলমে নাসুতে লিপিবদ্ধ করে আসো। এরপর আমাকে বসতে নির্দেশ দিলেন হজরত রসূলুল্লাহ স.। নির্দেশ মোতাবেক তাঁর স. সিংহাসনের নিকট বসে পড়লাম আমি। ইতোমধ্যে দেখলাম সেখানে দু'টি রূহ এসে উপস্থিত হলো। রসুলেপাক স. একটি রূহকে ডান জানুতে এবং আর একটি রূহকে বাম জানুতে বসালেন। এরপর সেখানে উপস্থিত ইমাম হাসান রা. এবং ইমাম হোসেন রা.কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের শহীদ হওয়ার বিষয়ে যখন আমি ধৈর্যধারণ করলাম এবং আল্লাহ্‌ পাকের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি অবলম্বন করলাম তখন একই সঙ্গে আমার উম্মতের ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে আমার পেরেশানী দেখা দিলো। এমন সময় হজরত জিবরাইল আমিন আ. এসে সুসংবাদ জানালেন আমাকে, 'আপনার এই দুই নাতির বংশধরগণের মধ্যে দুইটি রূহকে বিশেষভাবে জামাল (সৌন্দর্যমণ্ডিত) এবং জালাল (রোষতপ্ত) মর্যদায় ভূষিত করা হবে। তাঁদের দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ইসলাম সুদৃঢ় থাকবে। এই রূহ্‌ দুইটি বিশেষ মহত্বসম্পন্ন। আমার ডান জানুর রূহ্‌ গাউসুল আজম আবদুল কাদেরের। তিনি আলমে নাসুতে রহমতের শানে সৃষ্ট হবেন। তাঁর মাধ্যমে দুনিয়ায় প্রকাশিত হবে প্রকৃত হেদায়েত। আর আমার বাম জানুর রূহ্‌খানি দুনিয়ায় আসবে গাউসুল আজমের পরবর্তী জামানায়। তাঁর নাম হবে মখদুম আলী

আহমদ সাবের। কহর ও জালাল শানে সৃষ্টি হবেন তিনি। তাঁর মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হবে বেলায়েতের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হিংসুক সম্প্রদায়।

এই কথার পরে সমাপ্ত হলো রসুলেপাক স. এর বিশেষ দরবার। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ হলো আমার।'

সেই ভবিষ্যত বাণীই ক্রমে পরিণতির পর্যায়ে যাত্রা করেছে যেনো।

বড় হতে থাকেন আলী আহমদ। জামাল ও কহর সেফাতের উত্তপ্ততা তাঁকে সুস্থির হতে দেয় না মোটেও। অথচ স্বাভাবিকতা ফিরে না এলে তিনি প্রয়োজনীয় এলেম কালাম শিখবেন কেমন করে? দ্বীনের জ্ঞানার্জন যে প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর জন্য ফরজ।

মা হাজেরা ভাবতে থাকেন, কোন্‌ ওস্তাদ বুঝতে পারবে তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী পুত্র সন্তানকে। তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থাকে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রেখে কে তাঁকে দিতে পারবেন দ্বীনি এলেমের সঠিক তালিম? অনেক ভেবে ঠিক করলেন মা হাজেরা, ভাই ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র. এর হাতেই সোপর্দ করবেন তিনি আলী আহমদকে। তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি, যিনি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে আলী আহমদকে গড়ে তুলতে পারবেন জাহেরী এবং বাতেনী এলেমের মহাসমুদ্র হিসাবে।

না। আর কালক্ষেপণ নয়। বিশিষ্ট সুহৃদ প্রতিবেশী বুজুর্গ হজরত আবুল কাশেমকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন পাক পট্টন অভিমুখে। বিখ্যাত বুজুর্গ ভ্রাতা হজরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র. এর বসবাস সেখানে। সেখানে তার দ্বীনি প্রচারকেন্দ্র, মক্তব, মাদ্রাসা, খানকা, লঙ্গরখানা– সবকিছু। তাঁর কাছেই প্রিয় পুত্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এবার নিশ্চিন্ত হতে চান তিনি।

বহুদূরের পথ পাক পট্টন। হোক না বহুদূর। পথচারী তো পথের শেষে পৌঁছে যায়ই এক সময়। চলার গতি অবশেষে জয় করে নেয় উপনিতীর আনন্দকে।

পিছনে পড়ে থাকে খোটোয়াল। মা হাজেরা, আলী আহমদ এবং হজরত আবুল কাশেম ক্রমাগত পথ চলেন। শ্রান্তি নিবারণের জন্য আয়োজন হয় বিশ্রামের। বিশ্রাম শেষে আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয় পথ চলা।

পথে দেখা হয় হজরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র. এর একান্ত ভক্ত ও খাদেম হজরত আলিমুল্লাহ আবদালের সঙ্গে। সসম্ভ্রমে প্রস্তাব জানান আলিমুল্লাহ্ আবদাল, হুকুম পেলে এই গোলাম আপনাদের সঙ্গী হতে পারে।

তাঁকে লক্ষ্য করে অনুযোগ করলেন হজরত আবুল কাশেম, আলী আহমদের পিতার ইন্তেকালের সময় কোথায় ছিলে তুমি? এখন যে বড়ো শুভাকাংখী হতে এসেছো।

আলিমুল্লাহ আবদাল আদব সহকারে জবাব দিলেন, হজরত, অনেক দুরূহ খেদমতে এতদিন নিয়োজিত থাকতে হয়েছে আমাকে। আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে একাধারে অনেকদিন পর্যন্ত। এখন আবার আত্মপ্রকাশ করার হুকুম হয়েছে আমার। আজ থেকে আমি আলী আহমদের খেদমতে নিয়োজিত থাকবো। এটাই স্থায়ী হুকুম আমার প্রতি।

পথ ঘাট সব চেনা আলিমুল্লাহ্ আবদালের। অনেক পথের ক্লান্তি মাথায় নিয়ে এক সময় সবাই এসে উপস্থিত হলেন পাক পট্টনে।

অন্তরে উল্লসিত হয়ে উঠলেন হজরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র.। একদৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন আলী আহমদের প্রতি। যেনো জ্বলন্ত আগুন। সে আগুনের মাঝে ফুটে আছে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার অপার্থিব দ্যুতিচ্ছটা।

বোনের প্রস্তাব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি। আন্তরিক আশ্বাসবাণী শোনালেন তিনি বোনকে, তুমি নিশ্চিন্ত হও বোন। আলী আহমদ অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী। তাঁকে আমি জাহেরী ও বাতেনী এলেমে পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

জাহেরী এলেমের পাঠ শুরু হলো আলী আহমদের। অসাধারণ মেধাবী তিনি। অল্প দিনের মধ্যে তিনি হেফ্জ করে ফেললেন কোরআন মজিদ। তারপর একে একে আয়ত্ত করতে লাগলেন এলমে কালাম, ফেকাহ্, তফসীর ও হাদিস। সবাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। অন্য ছাত্ররা ছয় বছরে যা শিখে, তা তিনি শিখে ফেললেন তিন বছরের মাথায়।

এভাবে কেটে গেলো তিন তিনটি বছর। ভাইয়ের একান্ত অনুরোধে এতদিন এখানেই ছিলেন মা হাজেরা। এবার খোটোয়ালে ফিরে যেতে চাইলেন তিনি।

তার ফিরে যাবার আগেই ৬০৩ হিজরীর ২১শে শাওয়াল তারিখে হজরত গঞ্জেশকর এলমে মারেফতের পথে চিশতীয়া তরিকা অনুযায়ী বায়াত গ্রহণ করালেন আলী আহমদকে।

মা হাজেরা সব দেখে পরিতৃপ্ত হলেন। নিশ্চিন্ত মনে তিনি দেশে ফিরে যাবার প্রাক্কালে ভাইকে বললেন, অন্তর প্রশান্ত হয়েছে আমার। আমার এবার দৃঢ় আস্থা জন্মেছে, আপনার সুনজরের বরকতে আলী আহমদ এক সময় মঞ্জিলে মকছুদে

পৌঁছতে পারবে। আমি চলে যাচ্ছি ভাই। তবে যাবার আগে একটি অনুরোধ জানাবার আছে আমার। আলী আহমদ খুবই লাজুক। চেয়ে খেতে জানে না সে। এ ব্যাপারে আপনার সুনজর কামনা করি।

মৃদু হাসলেন হজরত গঞ্জেশকর। আলী আহমদকে ডেকে আনলেন তিনি তখনই। বললেন, কাল থেকে লঙ্গরখানার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হলো।

যাবার সময় আর একটি অনুরোধ জানালেন মা হাজেরা। বললেন ভাইকে, আপনার কন্যাকে আলী আহমদের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি আমি।

প্রসন্নমুখে হজরত গঞ্জেশকর জানালেন, দু'জনই তো তোমার সন্তান। তুমি এ ব্যাপারে যা করবে, আমার তাতে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

যাবার সময় হলো। মা হাজেরা চোখ মুছে যাত্রা করলেন খোটোয়াল অভিমুখে।

মা চলে যাবার পর অনেক কাঁদলেন আলী আহমদ। এ পর্যন্ত কোনোদিন মাকে ছাড়া থাকেননি তিনি। পিতা নেই। এখন মাতাও তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। আলী আহমদ হয়তো বা এই প্রথম অন্তরে অনুভব করলেন, 'বিচ্ছেদ বড়ই বেদনাদায়ক।'

বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র. এর দরবার।

চিশতীয়া খান্দানের প্রদীপ্ত সূর্য তিনি। যে সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়ে আছে শত শত গ্রাম, জনপদ, শহর।

দূর দূরান্ত থেকে প্রতিদিন মুরিদ ও ভক্তের দল এসে হাজির হয় তাঁর দরবারে। দলে দলে লোক আসে যায়। তাই দরবারে চালু রাখতে হয়েছে বিরাট লঙ্গরখানা।

দরবেশের দরবার। সহজ সাদামাটা অতিথি আপ্যায়নের আয়োজন। কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় সব সময়। কোনো মেহমান যেনো অভুক্ত না থাকে। নিয়মিত যেনো আহার পরিবেশন করা হয় সবাইকে।

এই বিরাট গুরুদায়িত্ব এবার অর্পিত হয়েছে আলী আহমদের স্কন্ধে। পীর মোর্শেদের একান্ত অনুগত খাস মুরিদ আলী আহমদ। অত্যন্ত শৃঙ্খলা এবং বিচক্ষণতার সাথে তিনি পালন করেন তাঁর দায়িত্ব। নিজ হাতে তিনি অতিথি অভ্যাগতদেরকে খাবার বণ্টন করেন। কিন্তু নিজে আহার করেন না কোনো কিছু।

এভাবেই অভুক্ত অবস্থায় তার দিন কেটে যায়। দিনের পর দিন কেটে যায়।

দিন পনের পরের ঘটনা। গভীর রাতে আলী আহমদের হুজরা থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো বাবা গঞ্জেশকর র. এর কানে। অনেকক্ষণ ধরে কান্না শুনলেন তিনি। কি করুণ! গভীর অন্তর নিংড়ানো কান্না। কি হয়েছে? ঠাহর করতে পারলেন না বাবা গঞ্জেশকর।

পরদিন লঙ্গরখানার দায়িত্ব শেষে যখন আলী আহমদ নিজের হুজরায় প্রবেশ করলেন, তখন তার পিছনে পিছনে বাবা গঞ্জেশকরও ঢুকলেন তার হুজরায়। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কালরাতে তুমি অমন করে কেঁদেছিলে কেনো বাবা?

আলী আহমদ জবাব দিলেন, আমার প্রতিদিনের তরিকার আমল সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। আমার অন্তর শুধু আল্লাহ্ প্রেমিক বুজুর্গ এবং অদৃশ্য জগতের অধিবাসীদের সঙ্গ কামনা করে।

আলী আহমদের জবারের প্রত্যুত্তর করলেন না বাবা গঞ্জেশকর। সেখান থেকে নীরবে প্রস্থান করলেন তিনি।

এভাবেই কেটে যায় দিন। লঙ্গরখানার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে চলেন আলী আহমদ। সবাইকে আহার করান। নিজে থাকেন অভুক্ত। কিন্তু তার এই অভুক্ত থাকার সংবাদ জানতে পারে না কেউ। সবাই শুধু লক্ষ্য করেন, দিন দিন কৃশ হয়ে পড়ছেন তিনি। আর সেই সঙ্গে তাঁর স্বভাবে বিকশিত হচ্ছে আগুনের মতো উত্তাপ। যেনো তিনি ক্রমাগত পরিণত হচ্ছেন এক বিশাল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে। তাঁর ইচ্ছার খেলাফকারীদের জন্য যে অনিবার্য ধ্বংস ছাড়া কিছু বাকী থাকবে না, এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় সবার মনে।।

এরই মধ্যে একদিন সংঘটিত হলো মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা।

বাবা গঞ্জেশকরের দুই বছর বয়স্ক এক শিশু পুত্র একদিন খেলতে খেলতে এসে হাজির হলো আলী আহমদ র. এর হুজরার সামনে। অবোধ শিশু। খেলাচ্ছলেই এক সময় সেখানে প্রস্রাব করলো শিশুটি। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজির হলো এক বিষাক্ত বিচ্ছু। বিচ্ছুটি কামড় দিলো শিশুটিকে। একটু পরেই শিশুটি ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

আর একবার বছর তিনেক বয়সের আর একটি শিশু তাঁর হুজরাখানার দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রক্তবমি শুরু হলো শিশুটির। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেলো সে।

সবাই বিস্মিত ও ভীত হয়ে গেলো এসব ঘটনা দেখে। বাবা গঞ্জেশকর বিস্মিত হলেন না একটুও। বরং তিনি সবাইকে ডেকে সাবধান করে দিলেন, আমি তো তোমাদেরকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি। মখদুম আলী আহমদ আল্লাহ্ পাকের উন্মুক্ত তলোয়ার। তোমরা শিশুদেরকে তার কামরার দিকে যেতে দাও কেনো? খবরদার। আর কখনো সেদিকে যেতে দিয়ো না কাউকে। আলী আহমদ যখন লঙ্গরখানায় খাদ্য বণ্টন করে, সে সময়েও কেউ তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ো না যেনো।

লঙ্গরখানাতেও একদিন ঘটলো এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বাবা গঞ্জেশকর র. এর বাইশ বছর বয়স্ক এক পুত্র একদিন লঙ্গরখানায় ঢুকে ভাণ্ডারীকে বললেন, আজ লঙ্গরখানার খাবার বণ্টন করবো আমি।

ভাণ্ডারী সন্ত্রস্থ স্বরে বললেন, সাবধান। আপনি তো আলী আহমদ সাহেবের অবস্থা জানেনই। তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। বাবা গঞ্জেশকর এর যুবক পুত্র ভাণ্ডারীর কথায় কর্ণপাত করলেন না। খাদ্য বণ্টন করলেন নিজ হাতে।

আলী আহমদ এলে তাঁকে দিয়ে কিছু খাদ্য বণ্টন করাবেন বলে ভাণ্ডারী কিছু খাদ্য একস্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সন্ধান পেয়ে সে খাদ্যও মেহমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন যুবক পীরজাদা।

কিছুক্ষণ পর সেখানে হাজির হলেন আলী আহমদ। ভাণ্ডারী ভয়ে ভয়ে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন আলী আহমদের নিকট। ঘটনা শুনে আলী আহমদ শুধু উচ্চারণ করলেন, বড় জ্বালাতনকারী তো।

ওদিকে সেই যুবক শায়েখ আজিমুদ্দিন তখন অন্দর মহলে মায়ের কাছে বসেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আলী আহমদের মন্তব্য উচ্চারণের সময়ই সেখানে উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করলেন আজিমুদ্দিন। এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনেও নির্বিকার রইলেন বাবা গঞ্জেশকর। মুখে শুধু উচ্চারণ করলেন, বেশ হয়েছে। নিজের কর্মফল ভোগ করেছে সে।

অতীতের উদরে আশ্রয় নিয়েছে সাতটি বছর। আলী আহমদ একই রকম বিশ্বস্ততা ও বিচক্ষণতার সাথে পালন করে চলেছেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব। একইভাবে প্রতিদিন তিনি সম্পন্ন করে যান খাদ্য বণ্টনের কাজ। প্রতিদিন অভুক্ত

থাকেন একইভাবে। আর একইভাবে বেড়ে চলে তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থার উত্তপ্ততা।

তিনি কৃশ হতে থাকেন ক্রমাগত। কৃশ থেকে কৃশতর হতে থাকেন।

ওদিকে বহুদূরে একান্ত বসবাসের মধ্য দিয়ে কেটে যায় মা হাজেরার দিন। নিরবচ্ছিন্ন এবাদতের মধ্য দিয়ে সান্ত্বনা খোঁজেন মা হাজেরা। থাক। দূরেই থাক আলী আহমদ। সাধনার সময় এখন তার। এসময় তাঁর নজরকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা না করাই উচিৎ। অন্তর থেকে তাঁর দোয়া নির্গত হতে থাকে আপনা আপনি– অনেক বড়ো আউলিয়ার মর্যাদায় উন্নীত করুন আল্লাহ্পাক তাঁর উদরের রত্নকে।

মাঝে মাঝে আলিমুল্লাহ আবদাল আসেন এদিকে। এই খোটোয়ালে। তাঁর কাছ থেকে তিনি খোঁজ নেন সন্তানের। খোঁজ নেন মা হাজেরা, কতো বড়ো হয়েছে আলাউদ্দিন? কি হাল এখন তার? ভাই গঞ্জেশকর তার প্রতি সন্তুষ্ট তো? আধ্যাত্মিক পথযাত্রায় এখন কতদূরে উপনীত হয়েছে সে?

সব সংবাদ শুনে মায়ের অন্তরে নামে বেহেশতী শান্তি। আল্লাহ্পাকের জন্যই তো তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর একমাত্র নয়নমনিকে। আল্লাহ্পাক তাকে তাঁর জন্যই কবুল করুন।

কিন্তু পর পর যখন হজরত বাবার তিন পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেলেন তিনি, তখন চিন্তায় পড়লেন রীতিমতো। আহা। কতোনা শোকাবহ সংবাদ। ভাইয়ের মনে কতোই না আঘাত লেগেছে। ক্ষমা চাইতে হবে ভাইয়ের কাছে।

বিচলিত হয়ে উঠলেন মা। ব্যস্তসমস্ত হয়ে যাত্রা করলেন পাক পট্টন শরীফে। ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই আলী আহমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বাবা গঞ্জেশকর কিন্তু নির্বিকার সান্ত্বনা দিলেন তিনি। বললেন, তোমার আফসোস করার কোনো কারণ নেই বোন। যা হয়েছে তা সব আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকেই হয়েছে।

পুত্রকে দেখতে চাইলেন মা। হজরত বাবার নির্দেশে আলাউদ্দিন আলী তৎক্ষণাৎ হাজির হলেন সেখানে। পুত্রের চেহারা দেখে বুক ভেঙ্গে গেলো হাজেরার। হায়! একি চেহারা হয়েছে সন্তানের। অস্থিচর্মসার শরীর। চক্ষু কোটরাগত। চেনাই যায় না ভালো করে। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কতোদিন ধরে খাওনা তুমি। একি চেহারা হয়েছে তোমার। একেবারেই খাওনা বুঝি?

এরপর ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, এতোবার করে অনুরোধ করে গেলাম আপনাকে। লাজুক ছেলে আমার। আপনি তো অনাহারে রেখে মেরেই ফেলবেন আলীকে।।

হজরত গঞ্জেশকর বললেন, তোমার সামনেই তো আমি তাকে লঙ্গরখানার ভার অর্পণ করেছি। সমস্ত খাদ্য বণ্টনের দায়িত্ব তো সেই পালন করে প্রতিদিন। আশ্চর্য! সে খায় না নাকি?

আলী আহমদ শিষ্টস্বরে উত্তর করলেন, হজরত মখদুম! লঙ্গরখানার ভার আপনি আমাকে দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু খাবার অনুমতি তো দেননি। আপনার অনুমতি ছাড়া আমার আহার করা কি শোভা পায়?

বাবা সাহেব জবাব শুনে বিস্মিত হলেন। সেই সঙ্গে আনন্দিতও হলেন আলাউদ্দিন আলীর কাণ্ড দেখে।

পরিতৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করলেন তিনি, বোন। আল্লাহ্তায়ালা আলাউদ্দিন আলী আহমদকে আহার করার জন্য দুনিয়ায় পাঠাননি। সেই শিশু বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে আসছে বহুবিচিত্র ও বিস্ময়কর কার্যাবলী। আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে সামনে। সবরের নেয়ামতের পরিপূর্ণ অধিকারী সে। আমি তাকে সাবের পদবী প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছি।

সাবের। ধৈর্যাবলম্বনকারী। আলাউদ্দিন আলী আহমদ যথার্থই সাবের। পরিপূর্ণ সাবের তিনি। সাত বৎসরের বিরামহীন অনাহারের একক সাবের তিনি। সবরের জগতে তিনি দৃষ্টান্তবিহীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আউলিয়া।

এই ঘটনার পর থেকে তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়লো 'আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবের', 'মখদুম সাবের' ইত্যাদি নামে।

ভ্রাতৃগৃহে আরো কয়েকদিন অবস্থান করতে মনস্থ করলেন মা হাজেরা। প্রিয়পুত্র মখদুম সাবের এখন যৌবনের সীমানায় পৌঁছেছে। বিয়ের বয়স হয়েছে তাঁর। বিয়েটা হওয়া দরকার এবার।

একসময় ভাইয়ের কাছে কথাটা পাড়লেন তিনি, ভাইজান। বিয়ের বয়স হয়েছে আলী আহমদ সাবেরের। এ ব্যাপারে আপনার কৃত ওয়াদা এবার পালন করুন।

বাবা ফরিদ বললেন, আমি আমার ওয়াদাতে কায়েম আছি। তোমার ইচ্ছা মোতাবেক দিন তারিখ ধার্য করো।

বিয়ের তারিখ ঠিক হলো। ২১শে শাওয়াল বুধবার দিন বিয়ে হবে। ৬১৩ হিজরী চলছে তখন।

শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। রাতে পুত্রবধুকে মখদুম সাবেরের কামরায় রেখে এলেন মা হাজেরা। কিছুক্ষণ পর হুজরায় প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালেন আলী আহমদ সাবের। আল্লাহ প্রেমের প্রবল ঘোর তখন তাঁর মনে মগজে সমস্ত সত্তায়। সে প্রেমের প্রবল তোড়ে ভেসে গেলো সব। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সব কিছু। ভেসে গেলো যেনো নিজের অস্তিত্বও।

তিনি অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর কামরায় উপবিষ্ট এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী। প্রশ্ন করলেন, কে তুমি? নববধু লজ্জাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমি আপনার সহধর্মিণী। আজই তো আপনি আমাকে আপনার খেদমতের জন্য কবুল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ্ প্রেমের সর্বধ্বংসী উন্মাদনা তখন চরমে চলেছে। বোধ করি নিজেকে শুনিয়েই তিনি উচ্চারণ করলেন অপার্থিব অচেনা কণ্ঠে, আল্লাহ্তায়ালা এক। তার মোকাবেলায় জোড়ার অস্তিত্ব কোথায়।

কথা শেষ হতেই কোথা থেকে যেনো ঝাঁপিয়ে এলো এক অগ্নিকুণ্ড। নববধুকে জড়িয়ে ধরলো অগ্নিকুণ্ডটি। সে আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো নবপরিণীতা সুন্দরী বধু।

এই ঘটনায় মা হাজেরা অন্তরে আঘাত পেলেন খুব। হায়! কোন স্বভাবের পুত্র তাকে দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। তার একান্ত সান্নিধ্যে আসবার ক্ষমতা রাখে না কেউ। এমন কি আপন স্ত্রীও।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন মা। এক সময় এই চিন্তার কারণেই হয়তো তিনি আক্রান্ত হলেন দূরারোগ্য যক্ষ্মারোগে।

রোগ বাড়তে লাগলো ধীরে ধীরে। শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন তিনি। সামনে উন্মোচিত হলো পরপারে পাড়ি দেবার পবিত্র তোরণ। সময় সন্নিকটে বুঝি?

৬২৪ হিজরী ২রা মুহররম দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করলেন তিনি। প্রসন্ন চিত্তে আলিঙ্গন করলেন পাক বারীতায়ালার একান্ত সন্নিধানকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মখদুম সাবের তখন অবস্থান করছেন দুনিয়ার মায়ামমতাবিনাশী এক অচিন জগতে। সেখানে শোক দুঃখ সুখ বিরহ, কোনো কিছুরই পদধ্বনি শোনা যায় না মনে হয়। মায়ের মৃত্যুতে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই পুত্রের। মায়ের মৃতদেহকে গোসল করানো হলো। কাফন পরানো হলো। দাফন করা হলো। কিন্তু মখদুম সাবের তাকালেনও না সেদিকে।

ভাণ্ডারী মওলানা আব্দুল কাশেম বললেন, আপনার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে। জানাযায় শরীক হওয়া উচিত আপনার।

কে জানে অন্তরে কি হাল হয়েছে আহমদ সাবেরের। মাতৃবিয়োগের শোকে কি চাপা পড়েছে তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ? নাকি কারো বিয়োগ ব্যথায় দুঃখ করবার সুযোগ থেকে আল্লাহ্পাকই তাঁকে বঞ্চিত করে রেখেছেন? সে কথার মর্ম কেউ জানে না। জানতে পারবেও না কোনো কালে।

সবাই শুধু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, নিজ হুজরায় প্রবেশ করলেন তিনি। যেনো কিছুই হয়নি তাঁর। কারো জন্য তেমন কিছু হয়ও না তাঁর কোনোদিন। তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ্রই। আর কারো নন। কারো কোনো কিছুই নন।

হুজরার দরজা একেবারে বন্ধ করে দিলেন তিনি। এভাবে হুজরাবদ্ধ অবস্থাতেই কেটে গেলো সুদীর্ঘ নয়টি বছর।

বাবা গঞ্জেশকর সব কিছু দেখলেন। বুঝলেন। কাউকে বললেন না কোনোকিছু। আলী আহমদ সাবেরকেও জাগালেন না তার নিমগ্ন অবস্থা থেকে।

নয় বছর অপেক্ষা করলেন পীর মোর্শেদ হজরত গঞ্জেশকর। তারপর ভাবলেন, এবার আল্লাহ্ প্রেমের এই চরম নিমজ্জিত অবস্থা থেকে জেগে উঠবার সময় হয়েছে আহমদ সাবেরের। সামনে আরো পথ পাড়ি দিতে হবে তাকে। প্রস্তুত হতে হবে আরো বৃহৎ দায়িত্ব পালনের জন্য।

নয় বছর পর একদিন সকালে এশরাক নামাজ শেষে তিনি আহমদ সাবেরের হুজরায় প্রবেশ করলেন। দেখলেন, দাঁড়িয়ে আছেন আহমদ সাবের নিশ্চল পাথরের মতো। তাঁর শরীর শুধু উপস্থিত আছে এখানে। আসল সত্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে মহব্বত ও মারেফতের কোন যে গভীর অতলে, তার সন্ধান পাওয়া ভার।

বাবা ফরিদ তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে উচ্চস্বরে সাত বার উচ্চারণ করলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

এবার ধীরে অতি ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন তিনি। চোখ মেলে দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হজরত মোর্শেদ নিজে। সচকিত হলেন তিনি। তাজিমের সঙ্গে কদমবুসি করলেন বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকরকে।

বাবা ফরিদ তাঁকে ইশারায় হুজরা থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন। ইশারার অনুগমন করলেন তিনি। দীর্ঘ নয় বছর পর তিনি তাকিয়ে দেখলেন বর্তমান পৃথিবীর দিকে। মনে হয় অচেনা জগত। পেছনে স্মৃতির অস্পষ্ট রেখাগুলো ওল্টাতে রাজী হয় না মন। আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অতিক্রান্ত পথে কি ফেরা যায় কখনো? জীবনের একি বিচিত্র নিয়ম। যাত্রা। শুধুই সম্মুখ যাত্রা। একবার অদৃশ্য অধ্যায়ে আর একবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব সীমানায়।

ঐ দিনই চিশতীয়া তরিকার নিয়মে শেষ অধ্যায়ের পরিণত বায়াতনামা সম্পাদিত হলো আহমদ সাবেরের। বায়াত শেষে বাবা ফরিদ তাঁর নিজের টুপি পরিয়ে দিলেন তাঁর মস্তকে। তারপর প্রদান করলেন খেলাফতের খেরকা। তাঁরপর তাঁর দিন রাতের কর্তব্যকর্মের নিয়ম বেঁধে দিলেন এভাবে– দিনে পীর মোর্শেদের খেদমতে থেকে আদব আহকাম অনুযায়ী জিকির ফিকির করে দুর্জ্ঞেয় রহস্যাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আর রাতে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হতে হবে আল্লাহ্পাকের হকিকতের মহাসমুদ্রে।

পীর মোর্শেদের নির্দেশ অনুযায়ী নিজের দায়িত্ব পালন করে চললেন আলী আহমদ। বাবা ফরিদ যতো দেখেন, ততই প্রীত হন মনে মনে। সত্যিই জুড়ি নেই আলী আহমদের। মারেফতের রহস্যঘেরা পথে আলী আহমদ এক দুঃসাহসী অভিযাত্রিক। একক অনন্য পথের সে বিরাম বিশ্রামহীন প্রেমিক। প্রেমের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল পরিধি সে সহজেই অতিক্রম করে উপনীত হয় প্রেমের বর্ণনাতীত তত্ত্বমূলে।

একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন বাবা ফরিদ। দেখলেন, তাঁর পীর মোর্শেদ খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র. তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি আলী আহমদ সাবেরকে সঙ্গে নিয়ে রসুলে করীম স. এর দরবার শরীফে হাজির হও। নির্দেশ পালন করলেন বাবা ফরিদ। রসুলেপাক স. প্রসন্ন চিত্তে আহমদ সাবেরের পৃষ্ঠদেশে চুম্বন করলেন। তারপর এরশাদ করলেন, হাজা অলিআল্লাহ্, ইনি আল্লাহ্র অলি।

সেই মুহূর্তেই ভেঙ্গে গেলো স্বপ্ন। বাবা ফরিদ নিশ্চিন্ত হলেন। স্থির প্রত্যয় জন্মালো তাঁর মনে– আহমদ সাবের এবার উন্নীত হয়েছেন কুতুবিয়াতের পদমর্যাদায়।

বিশিষ্ট বুজর্গানে দ্বীনের সম্মেলনের আয়োজন করলেন বাবা ফরিদ। সেই মোবারক সমাবেশে তিনি খেলাফতের পাগড়ী বেঁধে দিলেন আহমদ সাবেরের মস্তকে। তারপর ঘোষণা করলেন, তোমাকে আমি দিল্লী শহরের কুতুব নিযুক্ত করলাম। তবে একটি শর্ত আছে। এই নিযুক্তিনামায় শায়েখ জামালুদ্দিন হাঁশুবির মোহর অংকন করে নিতে হবে।

হাঁশী একটি জনবহুল জনপদের নাম। এই জনপদের সঙ্গে হজরত বাবা গঞ্জেশকরের জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

বাবা সাহেব তখন তাঁর পীর মোর্শেদের খেদমতে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োজিত ছিলেন। নিজের পীর মোর্শেদ ছাড়া কোনদিকেই নজর ছিলো না তাঁর। দীর্ঘকাল খেদমতের পর পীর মোর্শেদ হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র. তাঁকে বিবাহ করার নির্দেশ দিলেন।

পীরের আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু লজ্জা ও আদবের কারণে বাবা ফরিদ বিবাহের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর হজরত কাকী প্রশ্ন করলেন, বিয়ের ব্যাপারটা তুমি এড়াতে চাও কেনো?

ভয়ে ভয়ে প্রশ্নের জবাব দিলেন বাবা সাহেব। যদি আমার অসৎ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্র দরবারে আমাকে লজ্জিত হতে হবে, এরকম আশঙ্কা করি আমি।

হজরত কাকী তখন বললেন, যাও, তোমার যদি অসৎ সন্তান জন্মায় তবে তার দায়িত্ব আল্লাহ্পাকের এবং আমার। আর সন্তান নেককার হলে তা তোমার।

এবার আর কোনো ওজর রইলো না বাবা গঞ্জেশকরের। পীর মোর্শেদের কাছে বিদায় নিয়ে হাঁশীতে এলেন তিনি। সেখানেই আশ্রয় পেলেন তিনি তাঁর একনিষ্ঠ মুরিদ হজরত জামালুদ্দিন হাঁশুবীর। জামালুদ্দিন হাশুবীর খেদমত ও মহব্বতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি।

দীর্ঘ বারো বছর হাঁশীতেই অবস্থান করলেন বাবা ফরিদ। সংসার জীবনের সাথে একাকার হয়েও তিনি পালন করে গেলেন তাঁর কঠোর সাধনা আর চিশতীয়া তরিকায় তালিম প্রদানের কাজ। হজরত জামালুদ্দিন হাঁশুবীকে নির্বাচিত করলেন তাঁর প্রদান সহচর ও প্রিয়তম খলিফা হিসাবে।

মোর্শেদ দর্শনের আকাংখা প্রতিটি প্রকৃত মুরিদের অন্তরের অন্তর্গত আর্তি। কিন্তু দায়িত্ববোধ কখনো কখনো সে আকাংখার উপরে স্থান করে নেয়।

মোর্শেদ বিরহের চাপা দেওয়া আগুন এক সময় প্রজ্জ্বলিত হলো সমস্ত সত্তায়। বারো বছর পর এক রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে পিছনের সমস্ত টান ছিন্ন করে তাই বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকরকে হাজির হতে হলো দিল্লীতে, প্রাণ প্রিয় মোর্শেদের দরবারে।

মাত্র একদিন অবস্থান শেষে বাবা সাহেব পুনরায় হাঁশীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য এজাজত কামনা করলেন।

হজরত পীর মোর্শেদ বললেন, অবশ্যই হাঁশীতে যাবে তুমি। তবে আজ নয়, কাল যেও। আমার শেষ সময় সন্নিকটে। আল্লাহ্পাকের বিধান এই যে- আমার শেষ বিদায়ের সময় তুমি আমার কাছে উপস্থিত থাকতে পারবে না। আমি আমার আখেরী সফরের আগে তোমার আমানতগুলি কাজী হামিদুদ্দিন নাগুরীর নিকট গচ্ছিত রেখে যাবো। আমার ইন্তেকালের পরে পাঁচ দিন গত হলে তুমি সেগুলি তার কাছ থেকে নিয়ে নিও।

এরপর তিনি বাবা ফরিদের দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণের জন্য সবাইকে নিয়ে দোয়া খায়ের করলেন। তারপর আদেশ দিলেন, দুই রাকাত নামাজ আদায় করো। নির্দেশ মোতাবেক যথারীতি নামাজ আদায় করলেন বাবা ফরিদ।

পরদিন বিদায়ের পালা। বিদায়ের সময় উপদেশ দিলেন পীর মোর্শেদ হজরত কাকী র., নিজের পীরের রীতিনীতির উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থেকো। বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করো। বিপদে আপদে ভয় পেয়ো না কখনো। মনে রেখো দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার সবচেয়ে আপনজন। আমার স্থান প্রকৃতপক্ষে তোমারই স্থান। তোমার আমার মধ্যে এইই শেষ মোলাকাত।

হাঁশীতে ফিরে এলেন বাবা ফরিদ। ১৪ই রবিউল আউয়াল স্বপ্ন দেখলেন তিনি- হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী ইন্তেকাল করেছেন। পরদিন সকালে আবার তিনি যাত্রা করলেন দিল্লী অভিমুখে। ক্রমাগত চারদিন পথ চলার পর দিল্লী পৌঁছলেন তিনি। মোর্শেদের নির্দেশ মোতাবেক পীর মোর্শেদের মাজার শরীফ জেয়ারতের পর পঞ্চমদিনে সাক্ষাৎ করলেন কাজী হামিদুদ্দিন নাগুরী র. এর সঙ্গে।

কাজী সাহেবের কাছে গচ্ছিত ছিলো পীর মোর্শেদের জামা, লাঠি এবং একজোড়া কাঠের খড়ম। এসব আমানত তিনি বুঝিয়ে দিলেন বাবা গঞ্জেশকরকে।

পীর মোর্শেদের ফয়েজ বরকতে ভরপুর জামাটি পরিধান করে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করলেন বাবা ফরিদ।

তিনদিন অবস্থান করলেন দিল্লীতে। তারপর ঘোষণা করে দিলেন, আবার হাঁশীতেই ফিরে যাবেন তিনি। দিল্লীবাসীরা তাঁকে যেতে দিতে নারাজ। কাজী হামিদুদ্দিন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন পীর মোর্শেদের মোবারক এরশাদ, 'আমার স্থানই তোমার স্থান।'

কিন্তু কারো কথা শুনলেন না বাবা গঞ্জেশকর। বললেন, যে নেয়ামত তিনি আমাকে এনায়েত করেছেন তাতে জঙ্গল, জনপদ সব এক বরাবর। তারপর কালাম পাকের আয়াত পাঠ করলেন, 'ওয়া হুয়া মায়াকুম আয়না মা কুনতুম' যেখানেই তোমরা থাকো না কেনো তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের সঙ্গে আছেন।

আবার তাঁর প্রিয় শহর হাঁশীতে ফিরে এলেন বাবা সাহেব। কয়েকদিন পরে দ্বিতীয় বার বিবাহ করলেন। কিন্তু এখানেও বেশীদিন আর থাকা হলো না তাঁর। চলে গেলেন জন্মভূমি খোটোয়ালে। খোটোয়ালেও থাকলেন না বেশীদিন। তরিকা প্রচারের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করলেন অজুধন নামক আর এক স্থানে। সব শেষে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকলেন পাক পট্টনে।

কিন্তু হাঁশীর কথা ভুলতে পারলেন না তিনি। ভুলতে পারলেন না বিশুদ্ধ আল্লাহ্ প্রেমিক প্রিয় খলিফা জামালুদ্দিন হাঁশুবীর কথা। নিজেই নিয়ম করলেন তিনি, কাউকে খেলাফত দেয়া হলে খেলাফত নামায় হজরত জামালুদ্দিন হাশুবীর মোহর অংকন করে নিতে হবে।

ইতোপূর্বে হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়াসহ অন্যান্য সকল খলিফাকেই তাঁদের খেলাফতনামায় হজরত জামালুদ্দিনের নিকট থেকে মোহর অংকন করে নিতে হয়েছে।

এবার হজরত আলাউদ্দিন আলী সাবেবের প্রতিও একই নির্দেশ দেয়া হলো।

মোর্শেদের নির্দেশ। প্রথমে হাঁশী যেতে হবে। সেখানে সাক্ষাৎ করতে হবে হাঁশীর কুতুব হজরত জামালুদ্দিন র. এর সঙ্গে। খেলাফতনামায় লিখে নিতে হবে তাঁর অনুমোদন। তারপর সেখান থেকে দিল্লী। দিল্লীর দায়িত্ব তুলে নিতে হবে নিজের স্কন্ধে। যথাযথভাবে পালন করতে হবে দিল্লীর কুতুবের গুরুদায়িত্ব।

একটা খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে হাঁশী অভিমুখে রওয়ানা দিলেন মখদুম আলী আহমদ সাবের র.। অনেক পথ অতিক্রম করে হাঁশীর সন্নিকটে উপস্থিত হলেন তিনি।

তাঁর আগমন সংবাদ আগেই জানতে পেরেছিলেন হজরত জামালুদ্দিন হাঁশুবী। প্রিয় পীর ভাইকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তিনিও শহরের উপকণ্ঠে অপেক্ষা করছিলেন।

দেখা হয়ে গেলো দু'জনে। সালাম-কালাম হলো। কিন্তু মখদুম সাবের কেমন ভাবলেশহীন। খচ্চরের পীঠ থেকে নামলেন না তিনি। এমনকি চলাও বন্ধ করলেন না।

খচ্চরের পীঠে মখদুম সাবের। মাটিতে হজরত জামালুদ্দিন। পাশাপাশি চলতে চলতে এক সময় হজরত জামালুদ্দিনের দরবারে এসে হাজির হলেন দু'জনে।

হজরত জামালুদ্দিন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন, এই অলিআল্লাহ্ মখদুম সাবের কি রকম যেনো। অন্য কারো সঙ্গে তাঁর হাল তুলনীয় নয়। প্রখর সূর্যের মতো তিনি যেনো আপন আধ্যাত্মিক হালের কক্ষপথেই সারাক্ষণ পরিভ্রমণরত। আপন আগুনেই তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জমান। তাই তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই তিনি বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন বাহ্যিক সৌজন্যবোধ থেকে। কী বেপরোয়া অভিব্যক্তি তাঁর। হজরত জামালুদ্দিন ভালোভাবেই বুঝলেন, তাঁর জালালিয়াতের পথে সামান্য প্রতিবন্ধকতাও প্রশ্রয় পাবে না কখনো। জুলফিকার যেনো। উন্মুক্ত জুলফিকার।

মাগরিবের নামাজের সময় হলো। খানকা শরীফে নামাজ পড়লেন দুই বিখ্যাত বুজর্গ। নামাজ এবং প্রয়োজনীয় অজিফা আমল শেষ হতে রাত হয়ে এলো।

হজরত মখদুম সাবের কোনো রকম ভূমিকা না করেই তাঁর দিল্লীর কুতুবিয়াতের খেলাফতনামা পেশ করলেন হজরত জামালুদ্দিনের সামনে।

হেসে ফেললেন হজরত জামালুদ্দিন। বললেন, ভাই। এখন তো রাত হয়ে গেলো। বাতির ব্যবস্থাও তো নেই এখানে। তাছাড়া পরিশ্রান্ত আপনি। রাতটুকু বিশ্রাম করুন। কাল সকালে ইনশাআল্লাহ্ আপনার কাজ করে দিবো।

এ প্রস্তাব যেনো কানেই গেলো না মখদুম সাবেরের। আরাম বিশ্রামে তাঁর প্রয়োজনই নেই। পীর মোর্শেদের হুকুম ব্যতিরেকে অন্য কোনোদিকে নজরই নেই তাঁর। তিনি নিজেই খাদেমকে দিয়ে অন্দর মহল থেকে চেরাগ আনিয়ে নিলেন।

হঠাৎ দমকা হাওয়া এলো। চেরাগ নিভে গেলো। মখদুম সাবেরের স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিতা থমকে উঠলো যেনো। তিনি কালাম পাকের কিছু অংশ পড়ে নিজের আঙ্গুলে ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল জ্বলে উঠলো চেরাগের মতো। আলোকিত হয়ে গেলো সমস্ত ঘর। তখন বললেন তিনি, এই দেখুন এখন আর আলোর অসুবিধা নেই। মেহেরবাণী করে আমার কাজটা করে দিন।

ব্যাপার দেখে বিস্ময়ের সীমা রইলো না হজরত জামালুদ্দিনের। ভাবলেন তিনি, একি প্রখর হাল হজরত সাবেরের। এতটুকুতেই রোষান্বিত হয়ে পড়েছেন তিনি। কার সাহস আছে তাঁর সামনে টিকে থাকে।

চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় হজরত জামালুদ্দিনের। অনুযোগের সঙ্গে শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন তিনি, সম্মানিত ভাই আমার। আপনার হাল অত্যন্ত তেজস্বী। দেখলাম, সামান্য ব্যাপারেই আপনি কেমন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠেন। বহু সংখ্যক জনতার আবাস দিল্লীতে। তারা আপনার সম্মানের প্রতি সব সময় সচেতন নাও থাকতে পারে। এরকম অবস্থায় পুড়ে ভস্ম হওয়া ছাড়া তাদের কোনো নিস্তার থাকবে না।

একথা বলে কুতুবিয়াতনামা ছিঁড়ে ফেললেন হজরত জামালুদ্দিন। হজরত মখদুম সাবের আবারও জ্বলে উঠলেন। প্রজ্জ্বলিত কণ্ঠে বললেন, আপনি আমার কুতুবিয়াতনামা ছিঁড়ে ফেললেন, আমিও আপনার সিলসিলা ছিন্ন করে দিলাম। আপনার সিলসিলায় আর কোনো আউলিয়ার আবির্ভাব হবে না।

মনে হয় এরকম কোনো ঘটনার প্রত্যাশাতেই ছিলেন বাবা গঞ্জেশকর। দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বললেন, তিনি আল্লাহ্ তাঁদের মঙ্গল করুন। মনে হয় আজ দ্বীনের দুই দীওয়ানার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।

শংকাগ্রস্ত অবস্থায় সময় অতিবাহিত করছিলেন বাবা ফরিদ। মখদুম সাবের প্রত্যাবর্তন করলেন, উদ্বিগ্ন নয়নে তিনি তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। মোর্শেদের কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন মখদুম সাবের।

সব শুনে এরশাদ করলেন বাবা ফরিদ, জামালুদ্দিনের ছেঁড়া বস্তুকে ফরিদ জোড়া দিতে পারে না। তবে তুমি প্রশান্ত হও। শুভসংবাদ শ্রবণ করো। এর চেয়ে উত্তম পদমর্যাদায় ভূষিত করা হবে তোমাকে। তবে তুমি জামালুদ্দিনকে শেষে কিছু বলেছো নাকি?

মখদুম সাবের উত্তর করলেন, হাঁ। আমি রেগে গিয়েছিলাম। তারপর বলেছিলাম– আমিও আপনার সিলসিলা ছিন্ন করে দিলাম।

বাবা সাহেব বললেন, প্রথম দিকে লক্ষ্য ছিলো, না শেষ দিকে লক্ষ্য রেখে বলেছিলে একথা?

প্রথম দিকেই লক্ষ্য ছিলো আমার।

মখদুম সাবেরের জবাব শুনে মন্তব্য রাখলেন বাবা ফরিদ, তীরন্দাজের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তবু ভালো, শেষ দিকের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করোনি। শেষ দিকে তাঁর সিলসিলা আবার ইনশাআল্লাহ্ জারী হয়ে যাবে এভাবে– তোমার সিলসিলাতেই জামালুদ্দিন তাবরেজ নামে এক কুতুব পয়দা হবেন। জামালুদ্দিন হাঁশুবীর কনিষ্ঠ পুত্রের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তার নাম হবে কুতুবুদ্দিন হাঁশুবী। কুতুবুদ্দিন জামালুদ্দিন তাবরেজীর মুরিদ হয়ে উচ্চ পর্যায়ের কামালিয়াত অর্জন করবেন এবং শেষে লাভ করবেন কুতুবের মর্যাদা। এভাবে জামালুদ্দিন হাঁশুবীর সিলসিলা আবার জারী হয়ে যাবে।

এরপর নতুন পদমর্যাদা পেলেন মখদুম আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবের। কালিয়ার যেতে হবে তাঁকে। বাবা সাহেব জানালেন, কালিয়ারের কুতুব নির্বাচিত হয়েছো তুমি।

ডুমুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে ভাবেন মখদুম সাবের র.– কিভাবে দাওয়াতের কাজ শুরু করবেন। জনতার কোলাহল তিনি পছন্দ করেননি কখনো। আল্লাহ্পাকের জালালিয়াতের পবিত্র অনলের অন্তহীনতায় এতোদিন সফর করেছেন আপন মনে আপন উন্মত্ততায়।

কিন্তু এখন শুধু আপনাকে নিয়ে থাকলে তো চলবে না। আল্লাহ্পাকের পথভ্রষ্ট বান্দাগণকে আহবান জানাতে হবে সত্য পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য। মিশতে হবে মানুষের সাথে।

ডুমুর গাছটা কতো সুন্দর। ছায়া দেয়। বাতাস দেয়। আদর করে আপন জনের মতো। এই বৃক্ষের ফলগুলোও কতো সুস্বাদু। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ডুমুর ফলগুলোই যথেষ্ঠ। পাখির মতো নিষ্পাপ জীবন। গাছের আশ্রয়ে শান্তির নীড়। পাখির মতো গাছের ফল ভক্ষণ করে জীবন কাটানো। এরকম নিরুপদ্রব জীবনই তো কাম্য হওয়া উচিৎ সবার। চলে যখন যেতেই হবে।

কিন্তু কতো অবুঝ মানুষ। আত্মঅহংকারে মত্ত হয়ে নিসর্গের নিয়ম অস্বীকার করে। ভ্রান্তির কলুষ আহবানে সাড়া দিয়ে প্রশস্ত করে নিজেদের পতনের পথ। ফুল পাখি নদী বৃক্ষ আসমান জমিন সবকিছুই সর্বক্ষণ আল্লাহ্পাকের স্মরণে নিমজ্জিত থাকে। শুধু মানুষই বার বার ভঙ্গ করে নিসর্গের নীতিমালা। বিস্মৃত হয় আল্লাহ্র স্মরণ। বার বার তাই হাজির হয় পতনের প্রান্তদেশে।

কতো দয়া আল্লাহ্পাকের। পতনোন্মুখ মানুষকে উদ্ধারের জন্য তিনি যুগে যুগে প্রেরণ করেন নবী রসুল। সে ধারার সমাপ্তি ঘটেছে আখেরী রসুল স. এর আবির্ভাবের মাধ্যমে।

সেই শেষ নবী স. এর প্রতিনিধিদের প্রতি সে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এখন। শুরু হয়েছে কুতুব গাউস মোজাদ্দেদগণের রূহানী বংশপ্রবাহ।

সেই প্রবাহেরই এক অত্যুচ্চ উজ্জ্বল তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়েছে এই কালিয়ারে। ভ্রান্ত মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য এসেছেন কালিয়ারের কুতুব মখদুম আলী আহমদ সাবের কালিয়ারী।

স্থির করলেন তিনি, প্রথমে কালিয়ারের প্রধান জামে মসজিদে গিয়ে হাজির হতে হবে। সেখানে সমবেত মুসল্লীদেরকে দাওয়াত দিতে হবে– কালিয়ারের কুতুব হিসাবে, যেনো তারা তাঁকে স্বীকার করে নেয়। সবাই সহযোগী হয় যেনো তাঁর দ্বীনের প্রতি দাওয়াতের মহান কাজে।

জুমআর দিন প্রধান জামে মসজিদে উপস্থিত হলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন ভক্ত বাহাউদ্দিন। তিনি মসজিদে সমবেত প্রায় দুই হাজার মুসল্লির সমাবেশে প্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।

বললেন, হে সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দ। সুসংবাদ শ্রবণ করুন আপনারা। আজ মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন কালিয়ার শহরের নবনিযুক্ত কুতুব হজরত মখদুম আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবের। কুতুবুল আকতাব হজরত বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর তাঁকে কালিয়ারের বেলায়েত দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য তাঁকে স্বীকার করে নেয়া। তাঁর মোবারক হস্তে বায়াত গ্রহণ করে আল্লাহ্পাকের রহমত লাভের সুযোগ এখন আমাদের সামনে সমুপস্থিত। আহবান কবুল করুন আপনারা।

ভাষণ শুনে সারা মসজিদ জুড়ে শোরগোল শুরু হয়ে গেলো। এরকম ভাষণ তো তারা শোনেনি কোনোদিন। কেউ বললো, ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর আবার কে? তিনি আবার কালিয়ারের কুতুব নির্বাচন করবেন কেনো? কেউ মন্তব্য করলো, জানা নেই শোনা নেই এরকম লোকের কাছে আমরা বায়াতই বা গ্রহণ করবো কেনো? কেউ উক্তি করলো, আমাদের নেতাতো আছেনই। এখানকার রইসইতো আমাদের নেতা।

শোরগোল থেমে গেলো একসময়। নামাজ শুরু হলো। নামাজ শেষ হলো। নামাজ শেষে নামাজীরা ফিরে গেলো নিজ নিজ স্থানে।

না। সাড়া দিলো না কেউ।

মনক্ষুণ্ন হলেন না মখদুম সাবের। অবুঝ মানুষ। তাদের নেতাদের প্রদর্শিত ভ্রান্ত পথে অনুগমন করে তারা হারিয়ে ফেলেছে সত্য মিথ্যা বুঝবার জ্ঞানটুকুও। ধৈর্য ধারণ করতে হবে। প্রাণভরে দোয়া করতে হবে তাদের জন্য। হেকমতের সঙ্গে পরিচিতি দান করতে হবে সত্য পথের।

পরদিন আবার মসজিদে উপস্থিত হলেন মখদুম সাবের। উপস্থিত নামাজীদের উদ্দেশ্যে এবার নিজেই তিনি ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন। তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই কয়েকজন আপত্তি তুলে বললো, বন্ধ করুন আপনার বক্তব্য। আমাদের পীর কোরআন মজিদ। অনেক আগে থেকেই আমাদের ইমাম নির্বাচিত হয়ে আসছেন। নতুন ইমামের প্রয়োজন বোধ করি না আমরা।

হজরত সাবের তাদের জবাবে এরশাদ করলেন, শুনুন আপনারা। এই ফকির তার পীর মোর্শেদের হুকুম তামিল করার জন্য এখানে এসেছে। আপনাদেরকে হেদায়েতের পথে আহবান জানাবার জন্য এই ফকিরকে এখানে পাঠানো হয়েছে। কোরআন মজিদ সত্য কেতাব। শুরু থেকে আমাদের সিলসিলার শায়েখগণ কোরআনেরই অনুসারী। কোরআন মজিদ মানলে তো নবী রসুল এবং আউলিয়াকেও মানতে হবে। কারণ, কোরআন মজিদই তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করেছে। আর তাঁদের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছে কোরআনের প্রকৃত মর্মবাণী।

অসহিষ্ণু হয়ে পড়লো মসজিদের লোকজন। রোগগ্রস্ত অন্তঃকরণ তাদের। শারীরিকভাবে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রসনায় যেমন মিষ্ট বস্তুর আস্বাদ তিক্ত বলে অনুভূত হয়, তেমনি মখদুম সাবেরের পবিত্র বাক্যাবলীও তাদের নিকট তিক্ত বলে অনুভূত হলো। তাদের বিকৃত আকিদা বিশ্বাসের অর্গলাবদ্ধ দরজায় হেদায়েতের আলোকাঘাত বাধাগ্রস্ত হতে লাগলো বার বার।

মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো লোকজন। স্থানে স্থানে শুরু করে দিলো জটলা। এমন সময় তাদের নেতা রইস জামোয়ান উপস্থিত হলেন সেখানে।

সর্বপ্রথম কাজী তোবারক এগিয়ে গেলেন তাঁর সামনে। তারপর জানালেন, এই বিশৃঙ্খলার কারণ সম্পর্কে।

দূরদেশী এক আগন্তুকের আবির্ভাব হয়েছে এখানে। তার কোটোরাগত চোখের দৃষ্টি কী ভয়ানক তীক্ষ্ণ। ঝাঁকড়া কেশবিশিষ্ট দীর্ঘদেহী সেই আগন্তুক মসজিদে ইমামতি করতে চায়। তার হাতে সকলকে বায়াত হতে বলে। আগন্তুকের আচরণ সন্দেহজনক। মনে হয় আমাদের প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি সে উচ্ছেদ করতে চায়। এ জন্যই লোকজন বীতশ্রদ্ধ হয়ে দলে দলে মসজিদের বাইরে চলে আসছে।

সব শুনে রইস বললেন, ঠিক আছে। আগামী জুমআর দিন তার সম্পর্কে আলোচনায় বসবো আমরা। এখন নিজ নিজ কাজে চলে যাও সবাই।

পরের জুমআয় বহুলোক সমবেত হলো। মখদুম সাবেরও উপস্থিত হলেন সেখানে।

রইস জামোয়ান উঠে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, কোন্ ব্যক্তি ইমামতের (নেতৃত্বের) দাবী জানায়।

হজরত সাবের জবাব দিলেন, আমি।

রইস বললেন, বেশ আপনি যদি জামানার কুতুব হয়ে থাকেন, তবে বলে দিন, তিন মাস আগে আমার ধুসর রং এর যে ছাগলটি হারিয়ে গিয়েছে, সে ছাগলটি এখন কোথায়? যদি সে ছাগলের সন্ধান আপনি বলতে পারেন, তবে বিশ্বাস করবো আপনাকে। স্বীকার করবো আপনার নেতৃত্ব।

মখদুম সাবের এই প্রশ্ন শুনে অসন্তুষ্ট হলেন মনে মনে। কিছুক্ষণ একদম নীরব হয়ে রইলেন তিনি। ভাবলেন, জবাব দিলেইতো কারামত প্রকাশ হয়ে পড়বে তাঁর। অথচ কারামতপ্রদর্শনের অভিলাষী তিনি মোটেও নন। আবার জবাব না দিলেও লোকে মনে করবে, তাঁর কুতুবিয়াতের দাবী মিথ্যা। ফলে আবার তারা গোমরাহ্ রইস এবং কাজীর খপ্পরে পড়বে।

বাধ্য হয়ে মুখ খুললেন হজরত সাবের। বললেন, যারা সেই ছাগলটি জবাই করে খেয়েছে, এক্ষুণি তারা হাজির হও আমার সামনে।

মুহূর্তের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে মখদুম সাবেরের সামনে উপস্থিত হলো সাতাশজন লোক। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন হজরত, বলো, রইসের ছাগল কোথায় জবাই করে খেয়েছো তোমরা?

লোকগুলো পড়লো মহাবিপাকে। এতগুলো লোকের সামনে যে এবার নির্ঘাত চোর বলে প্রতিপন্ন হতে হবে। অপমান এড়াবার শেষ চেষ্টা করলো তারা। বললো, শুধু শুধু আমাদেরকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে। আমরা কোনো ছাগল জবাই করে খাইনি।

মখদুম সাবের এবার রইসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে শহরপতি। আপনার ছাগলের নাম ধরে ডাক দিন।

রইস তার ছাগলের নাম ধরে ডাকতেই সেই সাতাশজন লোকের পেট থেকে আওয়াজ বের হলো, আমি এখানে। এই লোকগুলো নদীর ধারে আমাকে জবাই করেছিলো। আমার নাড়িভুঁড়ি নদীতে ফেলে দিয়ে আমার গোশ্ত ভুনা করে খেয়েছে এরা।

আওয়াজ শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন রইস। উচ্চস্বরে বলে উঠলেন তিনি, অনন্যসাধারণ ব্যক্তি আপনি। আপনি নিশ্চয়ই সত্য কুতুব।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কাজী তোবারক। রইস বলে কি? লোকটি পাগল হয়ে গেলো নাকি। এই দরবেশকে কুতুব বলে স্বীকার করে নিলে যে তার নেতৃত্ব আর থাকে না, সে কথা কী ভুলে গেলো বুদ্ধিমান শহরপতি?

ত্রস্তে রইসের কাছে এগিয়ে গেলেন কাজী। কানে কানে বললেন, সর্বনাশা কথা বলেছেন আপনি। এ লোকতো খাঁটি যাদুকর। যাদুমন্ত্রের বলেই এরকম ঘটনা ঘটাতে পেরেছে সে। যাদুর ছলনায় আপনি ইমান হারালে সবাইতো আপনার অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। তওবা করুন। এক্ষুণি তওবা করুন।

প্রবৃত্তির প্রবল ধাক্কায় যেনো সংজ্ঞা ফিরে পেলেন রইস। তাইতো। অচেনা আগন্তুকের নেতৃত্ব তিনি মানতে পারেন কীভাবে?

কথা ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, না না ভুল হয়েছে আমার। এই ছদ্মবেশী ফকির যাদুকর। নিশ্চয়ই যাদুকর।

গোটা মসজিদ জুড়ে শুরু হয়ে গেলো কানাকানি। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন কথার শোরগোল শুরু হলো মসজিদে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের আঘাতে প্রতিঘাতে দুলতে লাগলো লোকজন। শেষে সবাই বলতে লাগলো একযোগে, রইস ঠিকই বলেছেন। অতি পুরাতন এই ঐতিহ্যবাহী শহরে নবাগত চালচুলাহীন একান্ত অপরিচিত এই ফকির আসলে যাদুকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্তরে আঘাত নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন মখদুম সাবের। হায়। কী অবুঝ তোমরা। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কেমন অবলীলাক্রমে মুখ ফিরিয়ে নিলে সবাই।

ডুমুর বৃক্ষের শীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় নিলেন মখদুম সাবের। অস্বীকৃতির আঘাতে তপ্ত হয়ে উঠেছে মন ও শরীর। কি করবেন এবার? ভেবে পান না তিনি।

সারারাত চিন্তা ফিকিরে কাটালেন তিনি। সকালে মনস্থির করলেন, এখানকার এই অবস্থা সম্পর্কে পীর মোর্শেদকে অবহিত করতে হবে। পীর মোর্শেদের পরামর্শ ছাড়া পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা না করাই উচিত।

একান্ত সহচর আলিমুল্লাহ্ আবদালকে তলব করলেন তিনি। বললেন তাঁকে, এই মুহূর্তে তুমি পাক পট্টন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যাও। সেখানে গিয়ে হজরত বাবা সাহেব কেবলাকে কালিয়ারের বর্তমান অবস্থা জানিয়ে দাও।

বিচলিত হয়ে পড়লেন হজরত বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর। কালিয়ারের প্রশাসক জামোয়ানের এতো বড় ধৃষ্টতা। কাজী তোবাররকই বা কেমন লোক। আলেম মানুষ। অথচ মূর্খের মতো আচরণ তার। এ কোন আত্মঅহংকারের সর্বনাশা খেলায় মত্ত হয়েছে তারা?

মখদুম সাবের উন্মুক্ত জুলফিকার। আল্লাহ্‌পাকের জালালিয়াতের আপোষহীন আগুন। কোন সাহসে তারা অবমাননা করেছে কালিয়ারের কুতুবকে?

নিজের হুজরা শরীফে নিজেকে আবদ্ধ করলেন বাবা গঞ্জেশকর। নিমগ্ন হলেন গভীর মোরাকাবায়। মোরাকাবা অবস্থাতেই তিনি কালিয়ারের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করলেন আকায়ে দোজাহাঁ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স.কে। তাঁর স. রূহানী নির্দেশও পেলেন বাবা সাহেব। নির্দেশানুযায়ী তিনি একটি হেদায়েতনামা লিখলেন। আলিমুল্লাহ আবদাল মারফত সে হেদায়েতের আহবানপত্র পাঠিয়ে দিলেন তিনি রইস জামোয়ান এবং কাজী সাহেবের নিকট।

বাবা সাহেবের পত্র নিয়ে পথে কোনো বিরতি না দিয়েই আলিমুল্লাহ আবদাল পুনরায় পৌঁছলেন কালিয়ারে। প্রথমে সাক্ষাৎ করলেন মখদুম সাবেরের সঙ্গে। তারপর বাবা সাহেবের পত্র পৌঁছে দিলেন রইস জামোয়ান এবং কাজীর নিকট।

পত্র পাঠ করে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কাজী তোবারক। বললেন, এতো বড়ো কথা। একটা বদ্ধ পাগলকে ইমাম হিসাবে মানতে হবে?

এরপর তিনি আলিমুল্লাহ্ আবদালকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শায়েখ ফরিদ যদি কালিয়ারে তার খলিফা নিযুক্ত করতে চান, তবে নিজে তিনি এখানে আসেন না কেনো? উনি নিজেইতো তাঁর খলিফার সঙ্গে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারতেন। তবে আমাদের মন্তব্যও সুস্পষ্ট। কোরআন পাকই আমাদের পীর। আর

আমাদের ইমামতের ধারা অনেক যুগ ধরেই আমাদের মধ্যে প্রবহমান। তোমাদের কথায় আমরা আমাদের ইমামতের ধারা বন্ধ করে দিতে রাজী নই।

আল্লাহ্ পাক তাঁর হুকুম নবী পাক স. এবং তাঁর জামানার পর নায়েবে নবী স.গণের মাধ্যমেই জারী রেখেছেন। আমার মনে হয়, সত্য নায়েবে নবী স. বাবা ফরিদের প্রস্তাব মেনে নেয়ার মধ্যেই আপনাদের কল্যাণ রয়েছে। ভেবে দেখুন ভালো করে।

আলিমুল্লাহ্ আবদালের একথা শুনে আরো বিরক্ত হয়ে উঠলেন কাজী সাহেব। বললেন তিনি, বেশতো। তোমাদের খলিফাকে তোমরা ইমাম বানালেইতো পারো। আমাদেরকে এর মধ্যে টানাটানি করার কী প্রয়োজন।

একথা বলেই বাবা ফরিদের চিঠিখানি পুড়িয়ে ফেললেন কাজী সাহেব।

মনোক্ষুণ্ন হলেন আলিমুল্লাহ্ আবদাল। প্রিয় পীরের পবিত্র পত্রের অবমাননা দেখে রোষান্বিতও হলেন। সমুদয় ঘটনা তিনি মখদুম সাবেরের নিকট খুলে বললেন।

মখদুম সাবের এরশাদ করলেন, ভাই আলিমুল্লাহ। তুমি আবার যাও তাদের কাছে। গিয়ে বলো, পত্রটি না পুড়িয়ে তিনি তা আমার নিকট ফেরত পাঠাতে পারতেন। আরো বলে এসো, বান্দার প্রতিটি কাজ তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়, একথা কি বিস্মৃত হয়েছেন আপনারা?

তারপর আপন মনেই বললেন যেনো, হায়। বাবা ফরিদের চিঠি পুড়িয়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামও যে লওহে মাহফুজ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

আবার পাক পট্টনে এলেন আলিমুল্লাহ্ আবদাল। সংঘটিত ঘটনার বিবরণ জানালেন বাবা গঞ্জেশকরকে।

ঘটনা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন বাবা সাহেব। আবার হুজরাবদ্ধ হলেন তিনি। সেখানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন পুরো তেরো দিন। তারপর হুজরা থেকে বেরিয়ে এসে রইস ও কাজীর নামে আবারো পত্র লিখলেন। শেষ পত্র। শেষ সাবধানবাণী।

'তোমরা মখদুম সাবেরের নিকট বায়াত গ্রহণ করো। তাঁর নেতৃত্বে রসুলে আকরাম স. এর প্রদর্শিত পথে কায়েম থাকবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হও। বায়াতের

মাধ্যমেই আল্লাহ্র রসুল স. এর প্রদর্শিত পথে কায়েম থাকা সম্ভব। বায়াত অস্বীকার করলে আল্লাহ্ ও তার রসুল স. এর প্রতি অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত হবে তোমরা। তোমরা তো জানো না মখদুম সাবেরের রোষান্বিত প্রার্থনার কারণে লওহে মাহফুজ থেকে নাম মুছে গিয়েছে তোমাদের। এর পরও যদি তোমরা রসুলেপাক স. এর প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের দাবীদারের প্রতি অনুগত না হও, তবে অপেক্ষা করো, সামনে এগিয়ে আসছে আতশ কহর এলাহীর ভয়াবহ গজব। তোমরা এখন কালিয়ারের কুতুবের আওতাধীন। তাঁর মাধ্যমেই তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ধারণ করবেন আল্লাহ্ বারী তায়ালা।'

পত্র লেখা শেষ করলেন বাবা গঞ্জেশকর র.। তারপর স্বাক্ষর করে আলিমুল্লাহ্ আবদালের হাতে দিলেন।

ঐদিনই আসরের সময় কালিয়ারে উপস্থিত হলেন হজরত আলিমুল্লাহ। এবার সোজা তিনি গিয়ে পৌঁছলেন রইসের মজলিশে।

মজলিশ সরগরম। অনেক লোকের মধ্যে সেখানে কাজী তোবারক এবং রইসও উপস্থিত ছিলেন যথারীতি।

আলীমুল্লাহ্ আবদালের নিকট থেকে চিঠি গ্রহণ করলেন রইস। চিঠির সিলমোহর ও তারিখ দেখে আশ্চর্য হলেন তিনি। এ চিঠি যে আজকের তারিখেই লেখা। এই পত্রবাহক একদিনে এতোটা পথ অতিক্রম করলো কী করে?

প্রশ্ন করলেন রইস জামোয়ান, আপনি কখন রওয়ানা হয়েছেন পাক পট্টন থেকে?

জোহরের নামাজের পর। উত্তর দিলেন আলিমুল্লাহ আবদাল। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন রইস, আশ্চর্য! এতো অল্প সময়ে এতদূরের পথ আপনি পাড়ি দিলেন কিভাবে? সত্যিই অসাধারণ ব্যক্তি আপনি।

আলিমুল্লাহ আবদাল বললেন, কুতুবে কালিয়ার মখদুম সাবেরের তোফায়েলে আল্লাহ্পাকই এ ক্ষমতা আমাকে এনায়েত করেছেন। আপনারাও মেনে নিন তাঁকে। তাহলে আপনারাও তাঁর তোফায়েলে এরকম অনেক মর্যাদা লাভ করতে পারবেন হয়তো।

রইসের ভাবভঙ্গি দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন কাজী তোবারক। অধৈর্য হয়ে তিনি রইসকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, হে শহরপতি। আপনি সরল মানুষ। তাই এ পত্রবাহক ফকিরের কথা আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। আসলে আমার মনে হয়, এ লোক মিথ্যাবাদী। আর তার আনীত চিঠিও জাল। সে যে এতো অল্পসময়ে পাক পট্টন থেকে এখানে আসতে পারে তার প্রমাণ কী? আপনি দেখি এ লোকের চালবাজিতে পড়ে কুফরির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন।

কাজীর কথা শুনে অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন হজরত আলিমুল্লাহ। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন তিনি, কাজী সাহেব। শুনে রাখুন। যে কাফের হওয়ার উপযোগী, সে অবশ্যই কাফের হবে। আর মোমেনের যোগ্যতাধারীরা অবশ্যই থাকবে ইমানের উপরে অটল। আপনার কথা লাগামহীন। লওহে মাহফুজ থেকে আপনাদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে। তাই বুঝি এরকম লাগামহীন উক্তি করতে সাহসী হয়েছেন আপনারা। জানি না সামনে কোন ভয়াবহ গজব অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য।

অস্বীকৃতিতে আরো দৃঢ় হয়ে গেলেন কাজী। আগের চেয়েও দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, এ তোমার অযৌক্তিক অপবাদ। তুমি ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে তোমাদের খলিফার অনুগত করাতে চাও। লওহে মাহফুজ থেকে নাম মুছে গেলে এতক্ষণ কী করে আমারা আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হলাম।

এ কথা বলেই কাজী বাবা সাহেবের পত্রের উল্টোপিঠে লিখে দিলেন, 'আমাদেরকে নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবেন না। আমাদেরকে আমাদের মতের উপরেই থাকতে দিন দয়া করে। না হলে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেন।'

শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেলো। সত্য প্রত্যাখাত হলো।

কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলেন না মখদুম সাবের। কাজী তোবারক যেনো অবিকল হামানের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে নিখুঁতভাবে। আর রইস নিয়েছে ফেরাউনের ভূমিকা। তাদের চক্রান্তের দরিয়ায় আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে আছে কালিয়ারের প্রায় সকল জনতা।

অভিমানে ভরে গেলো মখদুম সাবের কালিয়ারীর মন। অবোধ কালিয়ারবাসী। আপন জন চিনলে না তোমরা। একবারও দেখলে না মন মেলে, এই প্রেমিকের অন্তরের অঙ্গনে তোমাদের জন্যই সজ্জিত রয়েছে হেদায়েতের পুষ্পশোভিত অক্ষয় কানন। প্রকৃতপক্ষে পশু তোমরা। অবয়ব শুধু মানুষের মতো। অন্তরে অমানুষ।

অভিমানে অভিমানে ঘর্ষণ শুরু হয়। জ্বলে ওঠে ক্ষোভের ফুলকি। জ্বলে ওঠে রোষের সর্বনাশা দাবানল।

তবু ধৈর্যধারণ করেন তিনি। সাবের (ধৈর্যধারণকারী) উপাধি পেয়েছেন তিনি। প্রিয় পীর তাঁকে আদর করে ডাকে 'সাবের' বলে। কিন্তু আল্লাহ্পাকই যদি তাঁর নিজ ইচ্ছায় সে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন, তবে কী উপায় হবে?

পীর মোর্শেদের কাছে আর একটি চিঠি দিলেন মখদুম সাবের। হায়। এ কঠিন দায়িত্ব থেকে যদি অব্যাহতি পাওয়া যেতো।

হজরত মখদুম লিখলেন, 'সম্মানিত পীর কেবলা ও কাবা। এই ফকির প্রত্যাখ্যানের বাণে বিদ্ধ হয়ে সময় অতিবাহিত করছে। অসাফল্যের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত অন্তর। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। শ্বাস প্রশ্বাসেও এখন স্বাভাবিক নই আমি। আরজ, ফকিরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দিন।'

পত্র পেয়ে কঠিন শিলাখণ্ডের মতো হয়ে গেলো হজরত বাবা সাহেবের মুখমণ্ডল। অবস্থা দেখে আলিমুল্লাহ আবদাল সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন রীতিমতো। কালিয়ারবাসীদের বুঝি আর নিস্তার নেই।

ভয়ে ভয়ে বললেন তিনি, হজরত কেবলা ও কাবা। গোলামের উপর এবার কী হুকুম হবে? গোলাম এবার অবস্থান করবে কোথায়? এখানে, না কালিয়ারে?'

হজরত বাবা ফরিদ এরশাদ করেন, হঠাৎ তুমি ভীত হয়ে পড়লে কেনো বলতো? আলিমুল্লাহ আবদাল আরজ করলেন, হজরত, মনে হচ্ছে কালিয়ারে গজব নেমে আসবে এবার। ভয় হয়, সে গজবে আমিও হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবো।

সান্ত্বনা দিলেন হজরত বাবা, না। তোমার কোনো ভয় নেই। কালিয়ারে যাও তুমি। এখন তুমিই তাঁর একমাত্র সহচর।

আবার কঠিন নীরবতার মধ্যে স্থির হয়ে যান বাবা সাহেব। সামনের দৃশ্যাবলী স্পষ্ট হয়ে উঠছে যেনো। দৃষ্টির সমস্ত সীমানা জুড়ে শুধু আগুন আর আগুন। সে আগুনের লেলিহান শিখায় কালিয়ার জ্বলছে পুড়ছে। সেই সঙ্গে জ্বলছে কালিয়ারের অবাধ্য অধিবাসীবৃন্দ।

আলিমুল্লাহ আবদালের মাধ্যমে শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন বাবা গঞ্জেশকর, 'মখদুম সাবের। আল্লাহ্পাকের অদৃশ্য ইশারায় তোমাকে কালিয়ারের বেলায়েত দেয়া হয়েছে। সুতরাং কালিয়ারের ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'

বাবা সাহেবের চিঠি নিয়ে কালিয়ারে উপস্থিত হলেন আলিমুল্লাহ্ আবদাল। পত্র হস্তান্তর করলেন মখদুম সাবেরের নিকট। আবারো আসন্ন গজবের ভয়ে শংকিত হয়ে পড়লেন আলিমুল্লাহ আবদাল। একান্ত আদব সহকারে ভয়ার্ত স্বরে মখদুমের নিকট প্রশ্ন করলেন তিনি, হজরত, গোলাম আপনার নির্দেশ জানতে চায়। আমি কি এখানেই থাকবো, না অন্য কোথাও চলে যাবো?

স্বভাবসুলভ নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলেন মখদুম সাবের, শংকিত হয়ো না আলিমুল্লাহ। আমার পিছনে পায়ের কাছে অবস্থান করো তুমি। আগুনের আজাব যদি শুরু হয়, তবে আমার পিছনে কিছু অংশ নিরাপদ থাকবে আজাবের আওতা থেকে।

মুহাররম মাসের নয় তারিখ। বৃহস্পতিবার।

হজরত মখদুম আলী আহমদ সাবের কালিয়ারী র. এরশাদ করলেন, আলিমুল্লাহ। আর মাত্র একদিন সময় আছে হাতে। কালিয়ারবাসীরা যদি এখনো তওবা করে, তবে আসন্ন গজব থেকে পরিত্রাণের আশা করতে পারে।

আলিমুল্লাহ আবদাল মিনতি জানালেন শেষ বারের মতো, হজরত যদি প্রথমে গজবের সামান্য কোনো নিদর্শন প্রদর্শিত হয়, তবে হয়তো তারা ভীত হয়ে তওবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তা না করে একবারেই যদি আতশ কহরের গজব শুরু হয়, তবে তো আর কিছুই বাকী থাকবে না।

মখদুম সাবের মেনে নিলেন আলিমুল্লাহর আবেদন। তাই হোক। দেখি আর একবার সুযোগ দিয়ে। তওবাই তো আল্লাহ্পাকের নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল।

দরুদে সাইফুল্লাহ এবং দরুদে মখদুহ্ পড়ে আসমান ও জমিনের দিকে দম দিলেন মখদুম সাবের।

থর থর করে কেঁপে উঠলো কালিয়ার।

শুরু হলো ভূমিকম্প।

আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠলো কালিয়ারবাসী। সারা শহরে ছুটা ছুটি শুরু হয়ে গেলো লোকজনের।

কিছুক্ষণ কম্পনের পর স্থির হলো জমিন। নিশ্চিন্ত হলো জনতা। একটু পরে আবার ভূমিকম্প শুরু হলো। আবার থেমে গেলো কম্পন।

রইস জামোয়ান ভীত হয়ে ডেকে পাঠালেন কাজী তোবারককে। বললেন, কাজী সাহেব, বলুন দেখি আজ হঠাৎ তিন তিনবার ভূমিকম্প হলো কেনো?

কাজী বললেন, তাইতো। ব্যাপারটা আমার কাছেও বেশ আশ্চর্য লাগছে।

রইস বললেন, আমার কি মনে হয় জানেন কাজী সাহেব। মনে হয় কুতুবে কালিয়ারকে অস্বীকার করার কারণেই আমাদের প্রতি শুরু হয়েছে গজব। চলুন আমরা সবাই গিয়ে তাঁর কাছে তওবা করি। নাহলে হয়তো গোটা শহরেই গজব নেমে আসবে।

কাজী সাহেব কিন্তু তাঁর গোমরাহীতে অটল। রইসকে ভর্ৎসনা করলেন কাজী, আপনি কালিয়ারের সর্বময় কর্তা। আপনার ইচ্ছায় নির্ধারিত হয় আমাদের বেহেশত এবং দোজখ। আপনিই যদি সামান্য এক ফকিরের যাদু দেখে আতংকিত হন, তবে আমরা আর দাঁড়াবো কার কাছে গিয়ে। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। ফকিরকে শায়েস্তা করবার মতো লোক হয়তো আমরা পেয়েও যেতে পারি।

রইসের বিষণ্ন মুখ এবার আশান্বিত হয়ে ওঠে। জানতে চান তিনি, কে সেই ব্যক্তি?

কাজী বলেন, জাগলে নসরত একজন প্রখ্যাত মহিলা যাদুকর। তার স্মরণাপন্ন হয়ে দেখা যাক, সে মনে হয় উদ্ধার করতে পারবে ভূমিকম্পের সঠিক কারণ। তারপর তার মাধ্যমেই আমরা ফকিরের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে পারবো। যাদুর জবাব যাদু দিয়েই দিতে হবে।

কাজী তোবারকের পরামর্শ অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ ডেকে আনা হলো যাদুকর জাগলে নুসরতকে।

প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি বলতে পারেন, আজ তিন তিনবার ভূমিকম্প হবার আসল কারণ কী? একি কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, না ঐ ফকিরের যাদুক্রিয়ার ফল।

জাগলে নুসরত জবাব দিবার আগেই আবার কেঁপে উঠলো কালিয়ার। কেঁপে উঠলো রইস। তার ভয়ে বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে অভয়বাণী শোনালো যাদুকর, কোনো ভয় নেই। এ হচ্ছে সেই আলী আহমদ ফকিরের কাজ। যাদুবিদ্যার বাহাদুরী দেখাচ্ছে সে। সে মাত্র চার বার দেখালো। হুকুম যদি করেন, তবে আমিও এরকম এগারো বার ভূমিকম্প দেখাতে পারি।

রইস বললো, ঠিক আছে, তুমিও দেখাও তোমার যাদু। যাদু দেখিয়ে পরাস্ত করো ঐ উদ্ধত ফকিরকে।

জাগলে নুসরত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করলো। রইসের দরবারে তখন কাজী তোবারক ছাড়াও উপস্থিত ছিলো চারশো বায়ান্ন জন জননেতা। সবাই সবিস্ময়ে দেখলো, বার বার থেমে থেমে কেঁপে উঠলো সমস্ত কালিয়ার শহর। এরকম এগারো বার হলো।

আশ্বস্ত হলো সবাই। সবাই সিদ্ধান্ত নিলো একযোগে, না। কিছুতেই তারা ফকিরের নিকট পরাজয় মেনে নিবে না।

শেষ সুযোগের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেলো চিরতরে। না। হেদায়েতের উপযোগী নয় কালিয়ারবাসী। ধ্বংস তাদের অনিবার্য।

পরদিন। ১০ই মুহাররম। শুক্রবার।

কালিয়ারের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে উপস্থিত হলেন হজরত মখদুম সাবের। তাঁর সঙ্গী হলেন আলিমুল্লাহ আবদাল আর শায়েখ বাহাউদ্দিন।

মসজিদে ঢুকে প্রথম কাতারে মেহেরাবের কাছাকাছি বসলেন তাঁরা।

মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ যে আগে আসবে, সে-ই প্রথম কাতারে বসতে পারবে– এটাই আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান। ফকির আমির সব ভেদাভেদকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হয় এখানে।

কিন্তু কালিয়ারের ধর্মীয় নেতা এবং প্রশাসনিক নেতারা এখানে আল্লাহ্‌র বিধানের অবমাননা করে নিজেদের মনগড়া রীতিনীতি প্রবর্তন করেছিলো। তারা নিয়ম করেছিলো– মসজিদের প্রথম কাতারে দাঁড়াবে প্রধান রইস এবং অন্যান্য সর্দারগণ। দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়াবে ওলামা এবং শায়েখগণ এবং তারপর থেকে দাঁড়াবে অন্যান্য সাধারণ জনতা।

নামাজ শুরু হবার কিছুক্ষণ আগে মসজিদে উপস্থিত হলেন রইস জামোয়ান এবং কাজী তোবারক। তারা এসে দেখলেন, তাদের জায়গা দখল করে আছেন মখদুম সাবের এবং তার দুই সহচর।

কাজী তোবারক সরাসরি তিরস্কার করলেন মখদুম সাবেরকে, আপনার স্পর্ধাতো কম নয়। মাননীয় রইস তশরীফ এনেছেন। তাঁর জায়গা ছেড়ে দিন এক্ষুণি।

কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না মখদুম সাবের। দ্বিতীয় কাতারে সরে এলেন তিনি। এবারও তেড়ে এলেন কাজী। বললেন, আপনার দেখছি লজ্জা শরম মোটেও নেই। এ কাতার তো ওলামাদের জন্য নির্দিষ্ট।

এবার মুখ খুললেন হজরত মখদুম সাবের, মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। এখানে আমির ফকির ছোটো বড়ো কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ্‌র দরবারে সব মানুষ সমান। তবে কেনো তোমরা সৃষ্টি করেছো এই বৈষম্য। তওবা করো। আবার বলছি তওবা করো। নয়তো সামনে আসবে ভয়াবহ বিপদ।

মসজিদের লোকজন সবাই কাজী তোবারক আর রইসের অন্ধ অনুসারী। লোকজন মারমুখো হয়ে ওঠে সবাই। নানা অযৌক্তিক প্রশ্নবানে বিদ্ধ হতে থাকেন

হজরত মখদুম। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের নির্মম বৃষ্টি বিরামহীন ভাবে বর্ষিত হতে থাকে তাঁর উপর।

হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন হজরত সাবের। এই অন্তর্লোকপীড়িত বিভ্রান্ত জামাতকে কে করতে পারে সৎপথ প্রদর্শন? গোমরাহীতে যারা পাহাড়ের মতো অটল, আল্লাহ্‌পাক তো তাদেরকে কখনোই হেদায়েত দান করেন না।

বিক্ষত বুকের ক্ষোভানল বুকে চেপে রেখে মসজিদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন হজরত মখদুম। তবু কাজী তাঁকে বাক্যবান থেকে রেহাই দিলেন না। চিৎকার করে বলতে লাগলেন তিনি, হে দূরদেশী ফকির। আপনার যাদুকে ভয় পাই না আমরা। আমরাও আপনার চেয়ে বড়ো যাদুকর নিয়োজিত করেছি আপনার বিপক্ষে। এখন থেকে আর কোনোদিন আপনাকে আমাদের মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। আপনার যদি কোনো ক্ষমতা থাকে তবে দেখাতে পারেন।

মসজিদে নামাজ শুরু হয়ে গেলো। ইমাম কাজী তোবারক।

হঠাৎ অগ্নিগিরির রুদ্ধ মুখ খুলে গেলো যেনো। না। পথভ্রষ্ট এই ব্যক্তিদের জামাতে নামাজ আদায় করা যায় না কিছুতেই।

জামাত রুকুতে গেলো। সেই সময় বলে উঠলেন হজরত মখদুম, হে মসজিদ, তুমিও রুকু করো।

একথার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়লো বিশাল মসজিদ।

হজরত মখদুম বললেন, কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকো তুমি।

সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। হাজার হাজার লোক বিশাল মসজিদের নীচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো মুহূর্তেই। শহরময় ছড়িয়ে পড়লো সন্ত্রাস।

একটু পরেই সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে পড়লো আগুন আর আগুন। মুহূর্তের মধ্যে সে আগুন বার ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত সমস্ত শহর এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো

হজরত মখদুম তাঁর ক্ষুদ্র ভক্ত দলকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, জলদি করো, জলদি করো। সবাই চলে যাও এখান থেকে। এই গজবের আগুনের এলাকা থেকে ছুটে পালাও সবাই।

অগ্নি-আজাবের মহানায়ক মখদুম সাবেরের হুঁশিয়ারবাণী শুনে সেখান থেকে অতি দ্রুত সরে গেলেন আলিমুল্লাহ আবদাল, শায়েখ বাহাউদ্দিন, বৃদ্ধা গুলজারী বেগম- সবাই।

কালিয়ারের প্রান্তসীমায় শুধু নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কালিয়ারের কুতুব- হজরত মখদুম আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবের।

মানুষ নয়। সাথী হলো সেই ডুমুর বৃক্ষ।

সমস্ত শহর জ্বলছে। পুড়ছে। ঝলসে যাচ্ছে। শুধু কালিয়ারের নিঃসঙ্গ কুতুব আর নিঃসঙ্গ ডুমুর গাছটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিস্পলক নেত্রে তাকিয়ে দেখছে আল্লাহ্‌র আজাবের এক দৃষ্টান্তহীন দয়াহীন দৃশ্যের লেলিহান রূপ।

ডুমুর বৃক্ষের একটি ডাল আঁকড়ে ধরলেন হজরত মখদুম। যেনো তিনিও বৃক্ষ হয়ে গেলেন চিরদিনের মতো।

অভূতপূর্ব অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। যেনো দুনিয়াতেই নেমে এসেছে আখেরাতের ভয়াবহ দোজখের দাবানল।

ভীত সন্ত্রস্ত হলো সারা দেশবাসী। কালিয়ারের প্রজ্জ্বলিত দোজখানল ক্রমে ক্রমে সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে কিনা কে জানে। আতংকে অস্থির হয়ে গেলো জনতা।

দিল্লীর সম্রাট তখন সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ। আল্লাহভীরু বাদশাহ্‌ও ভীত শংকিত হয়ে পড়লেন কালিয়ারের ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ শুনে।

তিনি একখানা চিঠি লিখে তাঁর উজিরে আজমের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন পাক পট্টন শরীফে, হজরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র. এর নিকট। চিঠিতে লিখলেন–

'হজরত। কালিয়ারের ভয়াবহ ঘটনায় আতংকিত হয়ে পড়েছি আমরা। আতংকিত হয়েছে সারা দেশের মানুষ। নিতান্ত আরজ আপনার কাছে, আমাদেরকে হেফাজতের উপায় বলে দিন, যাতে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি।

হজরত বাবা সাহেব চিঠি পড়ে প্রীত হলেন। উজিরে আজমের সমাদর করলেন।

এরশাদ করলেন, বাদশাহ্‌ এবং অন্যান্য প্রজাসাধারণ নিরাপদ। যা হবার তা হয়ে গেছে। অবাধ্য কালিয়ারবাসীদের জন্য এ আজাব ছিলো আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রেত। তবে সাবধান হওয়া উচিৎ সবার। কালিয়ারের ধারে কাছেও যেনো না যায় কেউ। সেখানকার গজব কবলিত এলাকায় কেউ গেলে তাকেও পুড়ে মরতে হবে জলন্ত হুতাশনে।

এ আগুন নেভাতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

মখদুম সাবেরকে প্রশান্ত না করতে পারলে এ আগুন নিভবে না কোনোদিন। কিন্তু কার সাধ্য তাঁকে শান্ত করে?

অনেক ভেবে বাবা সাহেব তাঁর ছত্রিশ জন বিশিষ্ঠ খলিফাকে কালিয়ারে পাঠালেন। তাঁরা কালিয়ার শহরের সীমানায় পা দিতেই উত্তাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। আর অগ্রসর হতে পারলেন না সামনে। দূর থেকে শুধু দেখলেন, ডুমুর গাছের ডাল ধরে নিশ্চল বৃক্ষের মতোই দাঁড়িয়ে আছেন, কালিয়ারের তাপদগ্ধ কোহেতুর মখদুম সাবের র.। হুঁশ নেই তাঁর।

দিন যায়। রাত যায়। একদৃষ্টে তিনি তাকিয়েই থাকেন সামনের দিকে। ভস্মীভূত কালিয়ার ছাড়া যেনো তাঁর দেখবার মতো কোনো কিছু নেই পৃথিবীতে। ছিলোও না কোনোদিন।

থমকে দাঁড়ালেন শামসুদ্দিন তুর্ক।

আগুনের অসহ্য উত্তাপ যেনো সবকিছু ঝলসে দিতে চায়। তবু পৌঁছতে হবে মোর্শেদের সমীপে। কিন্তু সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আগুনের সমুদ্র। ভেবে পান না তিনি, কোন পথ ধরে এগুবেন এখন।

যতদূর দৃষ্টি যায়, জনমানবের চিহ্ন নেই। কাকে জিজ্ঞেস করবেন, কোন পথে পৌঁছতে হবে কালিয়ারের কুতুবের কাছাকাছি?

অগত্যা পিছিয়ে আসতে হলো তাঁকে। মেহমান হতে হলো হজরত জামালুদ্দিন আবদালের। তার কাছে তিনি খুলে বললেন সমস্ত ঘটনা।

তুর্কিস্তানের অধিবাসী আমি। নাম শামসুদ্দিন। মোর্শেদের তালাশে পথে প্রান্তরে শহরে জনপদে ঘুরে বেড়িয়েছি বছরের পর বছর। দর্শন লাভ করেছি শত শত

খ্যাতনামা আউলিয়ার। কিন্তু অন্তরের কাংখিতজন নির্বাচন করতে পারিনি কাউকে। বুঝতে পারিনি অনেক চিন্তা করেও, মন কি চায়? কাকে চায়। কোন মোর্শেদের কদমে সমর্পিত হতে চায় প্রেম-পীড়িত অবুঝ অন্তর।

এভাবেই মোর্শেদের তালাশ করতে করতে ষাট বছর বয়সের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। হঠাৎ সন্ধান পেলাম চিশতিয়া তরিকার মহান মোর্শেদ হজরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর র. এর। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছিলাম তাঁর মোবারক দরবারে। মনস্থির করেছিলাম, এই মহান বুজর্গের কাছে এবার সম্পূর্ণ সমর্পণ করবো নিজেকে। শুরু করবো সুশৃঙ্খল নিয়তে আল্লাহ্প্রাপ্তির পবিত্র সাধনা। কিন্তু বাবা সাহেব আমার আবেদন নামঞ্জুর করলেন। এরশাদ করলেন, দূরদেশী প্রেমিক পথিক। আমিতো এখন জীবন সায়াহ্নে এসে উপনীত হয়েছি। আমার আর নতুন ভাবে কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবার সময় নেই। তবে তোমাকে তোমার অন্তরের দরদ বুঝবার মতো একজন অনন্যসাধারণ মোর্শেদের সন্ধান দিতে চাই। যদি মন চায়, তবে তুমি তাঁর খেদমতে হাজির হতে পারো। আমার মখদুম সাবের একজন মহামর্যাদা সম্পন্ন আউলিয়া। আমি ধারণা করি, তুমি তাঁর কাছেই তোমার আকাংখিত উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে।

মখদুম সাবের। হজরত মখদুম আলাউদ্দিন আহমদ সাবের কালিয়ারী। তাঁর নামের মধ্যেই আমি যেনো খুঁজে পেলাম বহু যুগের তৃষিত অন্তরের শারাবন তহুরা। তাই উন্মাদের মতো ছুটে এসেছি কালিয়ারে। কিন্তু এ কোন বিস্ময় আমার সামনে। সামনে যে শুধুই আগুন। এ আগুনের সীমানা আমি কীভাবে অতিক্রম করবো এখন? মোর্শেদ-দর্শনের জন্য নয়ন অস্থির। মন বেচয়েন। বলুন কোন পথ ধরে যাবো আমি আমার মোর্শেদের কাছে?

সব শুনে শামসুদ্দিন তুর্ককে সান্ত্বনা দিলেন জামালুদ্দিন। বললেন, আলিমুল্লাহ আবদাল তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যান। দূর থেকে তাঁকে দেখে আবার ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে গেলে আপনি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন আশা করি।

শেষ পর্যন্ত আলিমুদ্দিন আবদালের শরণাপন্ন হলেন শামসুদ্দিন তুর্ক। তিনিই তাঁকে এক বিশেষ পথ ধরে নিয়ে গেলেন সেই ডুমুর গাছের কাছে। সেখানে মখদুম সাবের একইভাবে কালিয়ারের ভস্মীভূত শহরের দিকে একই দৃষ্টিতে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। একইভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন ডুমুর গাছের ডাল।

তাঁর পায়ের পিছন দিকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে পড়লেন শামসুদ্দিন তুর্ক। আশ্চর্য! এ স্থান যেনো বেহেশতের টুকরা। চারিদিকে দোজখের উত্তাপ। অথচ এ স্থানে যেনো বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ জান্নাতী বাতাস। নীরব নিথর পরিবেশ যেনো বার বার তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়।

সালাম করতে সাহস হলো না। এখানে নড়া চড়া করাও যেনো বেআদবী। মখদুম সাবেরের মোটেও খেয়াল নেই কোনোদিকে। দগ্ধীভূত কালিয়ারের শোকে তিনি যেনো ডুমুর বৃক্ষের মতোই নিশ্চল হয়ে গিয়েছেন চিরদিনের মতো। অথচ অভিমানবিক্ষুব্ধ তপ্ত চোখ থেকে তখনো ঠিকরে পড়ছে আগুন। শুধু আগুন। সর্বধ্বংসী অন্তহীন আগুন।

বাইশ দিন কেটে গেলো এভাবে। একসময় কী যেনো চিন্তা করে সুললিত স্বরে কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করতে লাগলেন শামসুদ্দিন তুর্ক। হজরত দাউদ আ. এর মতো মধুর তাঁর কণ্ঠস্বর। কোরআনের প্রেমভরা বাণীর অনুরণনে যেনো ক্রমে ক্রমে নিভে যেতে লাগলো মখদুম সাবেরের সুদীর্ঘ দিনের অনলাভিমান।

কোরআনের পবিত্র সুরলহরীতে যেনো অন্তরের অধ্যায়ন্তর ঘটতে শুরু করলো কালিয়ারের কুতুবের। ক্ষোভদগ্ধ উত্তেজনা যেনো গলে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে।

দীর্ঘক্ষণ তেলাওয়াতের পর থামলেন শামসুদ্দিন। একটু পরেই মখদুম সাবেরের কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো ছোট্ট বাক্য, থামলে কেনো?

প্রাণপ্রিয় মোর্শেদের প্রথম বাক্য শুনে ধন্য হলেন শামসুদ্দিন তুর্ক। বাআদব আরজ করলেন তিনি হজরত কেবলার সমীপে, এ গোলাম সার্বক্ষণিক খেদমতের আরজমন্দ।

মখদুম সাবের বললেন, মঞ্জুর। কিন্তু আমার সামনে এসো না কখনো।

আবার তেলাওয়াত শুরু করলেন শামসুদ্দিন তুর্ক। কোরআনের নূরসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন মোর্শেদ মুরিদ দু'জনেই।

আবার থামলেন শামসুদ্দিন। নিবেদন করলেন, হজরত কেবলা। এ গোলাম যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেনা। পা ব্যাথা হয়ে গিয়েছে।

মখদুম সাবের এরশাদ করলেন, বসে পড়ো।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন শামসুদ্দিন, হজরত দাঁড়িয়ে থাকলে এ গোলাম কিভাবে বসবার ধৃষ্টতা করতে পারে।

মখদুম সাবের বললেন, আমি বসতে পারি না যে।

শামসুদ্দিন বললেন, অনুমতি হলে গোলাম আপনাকে উপবেশনে সাহায্য করবে।

অনেক কষ্টে মখদুম সাবেরকে জমিনে বসালেন শামসুদ্দিন তুর্ক। দীর্ঘ আট বছর পর ক্ষণিক বিশ্রাম পেলেন। মখদুম সাবের। তাঁর পা মর্দন করে দিলেন শামসুদ্দিন অনেকক্ষণ ধরে। অনেক চেষ্টার পর কিছুটা আরামে বসতে পারলেন তিনি।

আবার তেলাওয়াত শুরু হলো। আবারও কোরআনের আওয়াজে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন দুই প্রেমদগ্ধ আল্লাহ্ প্রেমিক।

একসময় আবার কোরআনের পাঠ বন্ধ করতেই প্রশ্ন করলেন মখদুম সাবের, থামলে কেনো আবার?

আর বসতে পারছি না হজরত কেবলা। কোমরে ব্যথা শুরু হয়েছে আমার।

মখদুম সাবের এরশাদ করলেন, শুয়ে পড়ো।

জবাব দিলেন শামসুদ্দিন, হজরত যদি শায়িত হন, তবেই কেবল এ অধমের পক্ষে শায়িত হওয়া সম্ভব।

ঠিক আছে। আমাকে শুইয়ে দাও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি।

এজাজত পেয়ে প্রিয় মোর্শেদকে জমিনে শুইয়ে দিলেন শামসুদ্দিন। তারপর আবার কোরআন পাঠ শুরু করলেন।

কোরআন খতম হলো। তখন উঠে বসলেন হজরত সাবের। তারপর মোনাজাত করলেন অনেকক্ষণ ধরে। মোনাজাত শেষে এরশাদ করলেন- কে তুমি? কোথায় আবাস তোমার?

নিজের পরিচয় জানালেন শামসুদ্দিন, নাম আমার শামসুদ্দিন। তুর্কীস্তানের বাসিন্দা আমি। বহুদিন পর বহুপথ প্রবাসের জীবন কাটিয়ে হাজির হয়েছিলাম বাবা সাহেবের দরবারে। তিনি আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন।

মনে হয় জীবনে এই প্রথম মৃদু হাসলেন মখদুম সাবের। বললেন, আল্লাহ্র শামস্ আসমানে আর আমার শামস্ দেখছি জমিনে উদিত হয়েছে।

এরপর দু'জনে দু'জনের হাত বাড়িয়ে দিলেন। পবিত্র বায়াত গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। চিশতীয়া তরিকার সঙ্গে সংযুক্ত হলেন হজরত শামসুদ্দিন তুর্ক। কেটে গেলো তিন দিন।

হজরত সাবের এরশাদ করলেন, বাবা সামসুদ্দিন। তুমি চলে যাও পীর মোর্শেদ হজরত গঞ্জেশকর এর কাছে। তাঁর শেষ সময় সন্নিকটে। তাঁর শেষ সময়ে সোহবতের বরকত লাভ করবার সুযোগ নাও। তাঁর খেদমতে চুল পরিমাণও গাফিলতি করো না যেনো। তাঁর অন্তর্ধানের পর আবার কালিয়ারে ফিরে এসো তুমি। তখন শুরু হবে প্রকৃত বাতেনী তালিম।

আরো চার বছর পর ছুটি পেলেন বাবা গঞ্জেশকর। নশ্বর দুনিয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলেন তিনি।

৬৬৪ হিজরী, ৫ই মুহাররম নির্ধারিত হলো তাঁর দীদারের দিন। চিশতীয়া খান্দানের তেজদীপ্ত সূর্য অস্তমিত হলো দুনিয়ার আসমান থেকে। পরপারে উদয়ের পালা এবার। এবার শুধুই মাশুক মিলনের অন্তহীন অধ্যায়। এবার শুধুই বিরতিবিহীন বিশুদ্ধ মিলন।

ক্ষণিকের জন্য নিসর্গ নিশ্চল হয়ে গেলো যেনো। তারপর নিসর্গ আবার জারী রাখলো তার চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু প্রিয়জন হারানোর বিলাপধ্বনি ছড়িয়ে দিলো তার আকাশে বাতাসে তরু ও মরুর মধ্যখানে।

মনে মনেও এ সংবাদের পূর্বাভাস ঘোষিত হলো সবদিকে। অন্তরের ইশারা পেয়ে শেষ মোলাকাতের আশায় তাই হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়াও রওয়ানা হয়েছিলেন পাক পট্টন অভিমুখে। কিন্তু শেষ সাক্ষাৎ পেলেন না তিনি।

৬ই মুহাররম যখন তিনি পাক পট্টন পৌঁছলেন, জানাজা তৈরী তখন। জানাজায় শরীক হলেন তিনি। মোর্শেদ বিরহের তাজা ক্ষত বুকে নিয়ে অশান্ত অন্তরে তিনি পাক পট্টনে অবস্থান করলেন কয়েকদিন। তারপর পট্টনের খানকায় শায়েখ বদরুদ্দিন চিশতীকে গদ্দিনশীন নিযুক্ত করে ২১শে মুহাররম পুনরায় দিল্লী ফিরে এলেন দায়িত্বের টানে।

হঠাৎ খেয়াল হলো তাঁর। তাইতো। মখদুম সাবেরকে তো জানাজার সময় দেখেননি তিনি। জানাযার পরও পাক পট্টনে দেখেননি তাঁকে।

তবে কি প্রিয় মোর্শেদের তিরোধানের খবর পাননি তিনি। কে জানে এখন কোন হালে আছেন তিনি।

ভাবলেন হজরত নিজামুদ্দিন, এই আপনভোলা পীর ভাইকে প্রিয় পীর মোর্শেদের বিদায় সংবাদ পৌঁছানো একান্ত প্রয়োজন। তিনি তাঁর তিনজন খলিফা শায়েখ নাসিরউদ্দিন চেরাগে দিল্লী র., শায়েখ ওসমান র. এবং শায়েখ আজিজুল মাহমুদ র.কে সংবাদ জানানোর জন্য কালিয়ারে পাঠিয়ে দিলেন। নিজেও দু'দিন পরে উপস্থিত হলেন সেখানে। তাঁদের আগেই কালিয়ারে উপস্থিত হয়েছিলেন শামসুদ্দিন তুর্ক র.।

মোর্শেদের এরশাদ অনুযায়ী তিনি চার বছর বাবা সাহেবের খেদমতে কাটিয়েছেন পাক পট্টনে। এবার ছুটি পেয়ে ফিরে এসেছেন পুনরায় নিজ মোর্শেদের খেদমতে। কালিয়ারে।

সেই ডুমুর গাছের নীচে কালিয়ারের কুতুবের দরবার। দূরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। প্রেমোন্মত্ত মোর্শেদ কেবলা। আপন প্রেমের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকেন সারাক্ষণ। কী লাভ খোঁজ রেখে- কে আসে কে যায়। আসলে সবই তো অস্থির। অস্তিত্বহীন। আল্লাহ্পাকই একমাত্র অস্তিত্ববান। বরং আল্লাহ্ই অস্তিত্ব। লা মাওজুদা ইল্লাল্লহ্।

শামসুদ্দিন তুর্কের আগমন সংবাদ হজরত নিজামুদ্দিনই জানালেন প্রথম। জোহরের নামাজের পর শামসুদ্দিনের দিকে নজর করলেন হজরত মখদুম সাবের।

বুঝতে তাঁর বাকী রইলো না কি ঘটেছে। যাক। সবই চলে যাক এভাবে। পিতা নেই- মাতা নেই। স্ত্রীর দাবীদার হয়ে এসেছিলো মনে হয় একজন কেউ- সেও নেই। এখন প্রিয় মোর্শেদও আর নেই দুনিয়ায়। আসলে কোনো কিছুই নেই কোথাও- কেউই নেই। নেই। নেই। নেই। লা লা লা ।

না শোক। না আনন্দ। না বিরহ। না মিলন। সবকিছুই অনস্তিত্বজাত। অস্তিত্বের দাবীদার শুধু সেই। সেই চিরস্থায়ী জাত। লা মাওজুদা ইল্লাল্লহ্।

ঘোর কাটে। দায়িত্ববোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। হজরত মখদুম ডাকেন, শামসুদ্দিন। সামনে এসো। তুমি আমার মোর্শেদ কেবলার তাওয়াজ্জোহ্ এর বদৌলতে বেলায়েতের পদমর্যাদা অধিকার করতে সক্ষম হয়েছো। আমিও অভিনন্দন জানাবো তোমাকে। আমার পাগড়ীখানা নিয়ে এসো।

হজরতের পাগড়ী সামনে হাজির করলেন শামসুদ্দিন। অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগে প্লাবিত হয়ে একমাত্র মুরিদ এবং একমাত্র খলিফা হজরত শামসুদ্দিন তুর্ক এর মস্তকে নিজ হাতে পাগড়ী বেঁধে দিলেন হজরত মখদুম।

এরপর সুরা ফাতেহা পাঠ করলেন। পাঠ শেষে সবাইকে নিয়ে রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রাণভরে মোনাজাত করলেন তাঁর আধ্যাত্মিক বংশধারার একমাত্র রূহানী প্রদীপ হজরত তুর্ক এর জন্য।

এরপর এক দুপুর এক রাত ধরে তিনি প্রিয় পীর ভাই হজরত নিজামুদ্দিনের সঙ্গে একান্ত আনন্দচিত্তে অনেক আলাপ করলেন। মনে হলো নতুন জীবন পেয়েছেন তিনি। দীর্ঘ বারো বছর পর যেনো তিনি ফিরে পেয়েছেন তার স্বভাবের বিপরীত আনন্দময় অবস্থা।

বিদায়ের সময় আবার তিনি ফিরে গেলেন তাঁর স্বভাবজাত কঠিন উদাস অবস্থার অন্তরালে। মনে হয় ভ্রাতৃ-বিরহের শোক এভাবেই আড়াল করতে হয়।

যাবার সময় শুধু বললেন, প্রিয় ভাই। চলে যাচ্ছো? আল্লাহ্পাক তোমার মঙ্গল করুন। হজরত মোর্শেদ বাবা তোমাকে মাহবুবে এলাহী উপাধি দিয়েছেন। আমিও সেই নামেই ডাকি তোমাকে। তুমি সত্যিই মাহবুবে এলাহী (আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ)।

জীবন বহমান।

সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা পালাক্রমে পথ চলে জীবনের নিয়মিত পথ ধরে। এভাবেই জীবন বয়ে চলে সর্বত্র।

কালিয়ারের অগ্নিঅধ্যায়েও একসময় নেমে আসে যবনিকা। ক্রমে ক্রমে কালিয়ারের পথ ধরে শুরু হয় পথিকের আনাগোনা। ভয়ভাবনা কেটে যায় তাদের। আশে পাশে শুরু হয় নতুন বসতি নতুন আশায়।

কালিয়ারের কুতুব অবস্থান করেন সেই ডুমুর বৃক্ষের নিচেই। তাঁর উত্তপ্ত অবস্থা শীতল হয়ে আসে ক্রমে ক্রমে। নতুন বসতি দেখে তাঁর প্রাণে জাগে মমতার জোয়ার।

হজরত নুহ আ. এর মহাপ্লাবনের পর মানবতা যেমন পরিশুদ্ধ হয়ে আবার শুরু করেছিলো তার নতুন অভিযাত্রা। তেমনি আগুনে পুড়ে পরিশুদ্ধ কালিয়ারেও যেনো শুরু হলো নতুন জীবন। প্রাণ ভরে দেখেন হজরত মখদুম, মানুষ আবার আবাস গড়েছে তাঁর সাধের কালিয়ারে।

ঘর বাড়ী নেই শাহ মখদুম সাবেরের। ডুমুর বৃক্ষের নিচে উন্মুক্ত সংসার। চাল চুলো নেই। পরিবার পরিজন- তাও নেই। সাথী শুধু প্রিয় মুরিদ, একমাত্র মুরিদ এবং একমাত্র খলিফা হজরত শামসুদ্দিন তুর্ক।

ক্ষুধা অনুভব করলে তিনি এরশাদ করেন, শামসুদ্দিন। কী আছে মওজুদ?

শামসুদ্দিন তখন ডুমুর গাছ থেকে দু'একটি তাজা ডুমুর হাতে তুলে দেন প্রিয় মোর্শেদের।

ডুমুর খেয়ে আনমনে বলেন শাহ্ মখদুম, শামসুদ্দিন দেখো। আল্লাহ্পাক আহার গ্রহণ থেকে পবিত্র। মানুষ আহারের মুখাপেক্ষি। আহার তাকে করতেই হয়, যতক্ষণ এই জড়দেহে প্রাণ থাকে। এই দেহই অন্তরায়। দেহ ত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধুর মিলন হয় না।

খুব কম কথা বলেন শাহ সাবের। হঠাৎ কখনো কথা বলেন। দু একটি কথা বলেই আবার তন্ময়তার ঘোরে হারিয়ে ফেলেন নিজেকে। আল্লাহ্ প্রেমের কোন্ মহাসমুদ্রের তলদেশে যে তাঁর আসল আবাস- বাইরে দেখে তার পরিচয় কে বুঝতে পারে? এমন দুঃসাহস কার?

নামাজের সময় হলে তিনি এরশাদ করেন, শামসুদ্দিন। দেখো শরীয়তে মোহাম্মদী স. এর কী অপরূপ নিয়ম। সালাতে সজ্জিত বান্দা কতো সহজেই লাভ করতে পারে কাংখিত শান্তি।

পীর মোর্শেদের নির্দেশে আজান দেন শামসুদ্দিন তুর্ক। তারপর প্রেমভারে উতলা হয়ে নামাজে দাঁড়ান দু'জনে। ইমামের দায়িত্ব পালন করেন শামসুদ্দিন তুর্ক। মখদুম সাবের তার এক্তেদা করেন। উপরে বৃক্ষপত্রের ছাউনি। নিচে মাটির মুসাল্লা। চির উন্মুক্ত মসজিদ।

নিয়মিত নামাজ আদায় শেষে আবার গভীর মগ্নতায় নিজেকে ভাসিয়ে দেন শাহ্ মখদুম। শামসুদ্দিন থাকেন সদাসতর্ক। কে জানে কখন মোর্শেদের কী এরশাদ নেমে আসে। হুকুম তামিল করতে বিলম্ব হওয়া যে বেয়াদবিরই নামান্তর।

দিকে দিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে মখদুম সাবেরের। দূর থেকেই তাঁকে মনে মনে ভক্তি শ্রদ্ধা করে মানুষ। কাছে আসার সাহস সাধারণতঃ হয় না কারোই।

একবার আমির খসরু এলেন কালিয়ারে।

আমির খসরু। স্বনামধন্য আউলিয়া কবি। মাহবুবে এলাহী হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার তিনি প্রিয় খলিফা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শুনে আসছিলেন কালিয়ারের এই বিস্ময়কর কুতুবের কথা। আল্লাহ্ প্রেমের বেহুঁশী অবস্থাতেই তাঁর দিন রাত সারাক্ষণ কাটে। সংসার বাঁধেননি হজরত। হজরত ঈসা আ. এর মতো গৃহহীন তিনি। পাখির মতো নিষ্পাপ জীবন। পাখির মতোই আহার করেন শুধুমাত্র ডুমুর বৃক্ষের ফল।

নিজের পীর মোর্শেদের এজাজতক্রমে একদিন কালিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন তিনি। কালিয়ারের কাছাকাছি পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আমির

খসরু। দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখলেন, কালিয়ারের কুতুবের জ্যোতির্ময় নূরসমুদ্রের মধ্যে যেনো সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়ে আছে এখানকার আকাশ বাতাস জমিন।

আপনা আপনি অন্তরের অন্তমূল থেকে হজরত আমির খসরুর কণ্ঠে উঠে আসে হামদ ও নাতের হৃদয়প্লাবী সুরলহরী। সে সুরের ধ্বনি গিয়ে পৌঁছায় হজরত শাহ্ মখদুম সাবেরের কানে। তিনি উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। বলেন, কোন্ প্রেমিক মেহমান হাজির হয়েছে কালিয়ারে? তাঁর প্রেম-সঙ্গীতে যে দুলে উঠছে আল্লাহ্র আরশও।

হজরত আমির খসরু সামনে এসে সালাম জানালেন। কদমবুসি করলেন। তারপর নিজের পরিচয় দিলেন।

মখদুম সাবের র. বললেন, মাহবুবে এলাহীর কাসিদা শোনাও আমাকে।

হৃদয় জখম করা সুরে আবৃত্তি শুরু করলেন আমির খসরু। একে একে শেষ করলেন অনেক অন্তরস্পর্শী পংক্তিমালা।

হজরত মখদুম বললেন, ভাই মাহবুবে এলাহী ভালো আছেন তো?

আমির খসরু জবাবে জানালেন, জী-হাঁ হজরত। ভালো আছেন তিনি।

হজরত মখদুম প্রশ্ন করলেন, তাঁর দরবারে তো লোকজনের ভীড় অনেক। কী পরিমাণ লোকেরা হেদায়েত লাভ করছেন তাঁর মাধ্যমে।

আকাশের নক্ষত্রের মতো বেশুমার।

জবাব দিলেন আমির খসরু।

হজরত জবাব শুনে খুশী হলেন খুব। হাসলেন তিনি। তারপর বললেন, আমার শুধুমাত্র শামসুদ্দিনই সম্বল। আমি দোয়া করি, ভাই মাহবুবে এলাহীর মাধ্যমে হজরত মোর্শেদ কেবলা র. এর নাম মোবারক রওশন হোক। পথভোলা মানুষেরা লাভ করুক সরল পথের দিশা।

হজরতের সাধারণ অভ্যাস ছিলো সপ্তাহে একদিন ডুমুর ফল এবং কচি পাতা চিবিয়ে এক সপ্তাহের রোজা ভঙ্গ করা। খাবার কথা খেয়াল হতো খুব কমই। শামসুদ্দিন তুর্কও একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতেন তাঁকে।

কিন্তু এ দিয়ে কি মেহেমানদারী করা যায়? অথচ উপায়ও নেই আর। মেহেমানের আহারের জন্য তিনি শুধু বাড়তি কিছু লবণের আয়োজন করলেন। নির্দেশ দিলেন, ডুমুরের সঙ্গে যেনো কিছু লবণও পরিবেশন করা হয় মেহমানের দস্তর খানায়।

ওদিকে দিল্লীতে অস্থির অন্তরে কাল কাটাচ্ছিলেন মাহবুবে এলাহী হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া র.। আমির খসরু ফিরে এলে তিনি জানতে পারবেন তাঁর

প্রিয় ভাইয়ের খবর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অনেক পথ এগিয়ে এসে আমির খসরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তিনি। তাঁর চোখে মুখে হাতে চুমু খেলেন।

বললেন, তোমার এ হাত দিয়ে তুমি কদমবুসি করেছো ভাই মখদুম সাবেরকে। চোখ দিয়ে দেখছো তাঁর পবিত্র বদন। আজ কেনো তোমার জন্য কোরবান হবো না আমি?

আমির খসরু কিছু ডুমুর ফল প্রিয় মোর্শেদের হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো আপনার জন্য পাঠিয়েছেন হজরত মখদুম। হজরত নিজামুদ্দিন অনেকের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন কালিয়ারের এই কালজয়ী নিদর্শন। ডুমুর ফল নিজেও কিছু মুখে দিয়ে বললেন, এ যে অমূল্য নেয়ামত। ফয়েজ বরকতে পরিপূর্ণ এই অমূল্য তোহফা সংগ্রহের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত মানুষেরা ছুটে যাবে কালিয়ারের অনন্যমর্যাদাসম্পন্ন কুতুবের দরবারে।

সূর্য অস্ত যায়। দিন শেষে পাখি ফিরে যায় নীড়ে। নদীর প্রবাহ মিশে যায় সাগরের ঠিকানায়। মানুষও তেমনি। কাজশেষে ফিরে যায় তার পরম প্রভুর কাছে। যেতেই হয়।

মখদুম সাবেরের কানে যেনো ভেসে আসে কোন্ অবোধ্য জগত থেকে মন মাতাল করা ভাষাহীন আহবান। যার সহজ শাব্দিক অনুবাদ মনে হয়- শেষ। সময় শেষ। প্রাণপাখি ছটফট করে। উড়ে যেতে চায়। সেদিকেই উড়ে যেতে চায়।

শেষ কর্তব্য আর একটিই মাত্র। তা সম্পাদন করতে হবে। আর তা সম্পাদন করতে যেয়ে একমাত্র সাথী শামসুদ্দিন তুর্ককে বিদায় দিতে হবে। তারপর একা। আগের মতো আবার একক জীবন। নিঃসঙ্গ নিয়মে সম্পন্ন করতে হবে পরপারের আয়োজন।

দিল্লীর সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ খিলজী বড়ই উত্তম ব্যক্তি। যেমন তিনি ধর্মপ্রাণ, তেমনি ন্যায়পরায়ণ প্রজাবৎসল এবং বিচক্ষণ শাসক। কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর তিনি মুসলমান সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করবার জন্য অনেকদিন থেকে শত্রুদের ভিলসা দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করে

আসছিলেন। কিন্তু বার বার কেল্লা অবরোধ করেও আজ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারেননি।

মখদুম সাবের র. তাঁর প্রতি মনোযোগী হলেন। এই ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ সত্যিই দরবেশদের রূহানী সাহায্য পাবার অধিকারী।

মনস্থির করলেন মখদুম সাবের, শামসুদ্দিন তুর্ককেই তাঁর সাহায্যে পাঠাতে হবে। সুলতানের সেনাদলে শামসুদ্দিন যদি অবস্থান করেন, তবে তাঁর অসিলাতে আল্লাহ্পাক মুসলমান বাহিনীকে বিজয় দান করবেন।

এরশাদ করলেন তিনি, শামসুদ্দিন বাবা। তোমাকে আলাউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ্ খিলজীর সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। তুমি সেখানে না গেলে ভিলসার কেল্লা মুসলমানদের অধিকারে আসবে না।

মোর্শেদের মোবারক এরশাদ। নির্বিবাদে মেনে নিতে হলো।

মন কাঁদে। প্রিয় মোর্শেদের সান্নিধ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। মোর্শেদ বিচ্ছেদের চেয়ে বেশী আর কোন্ শোকাবহ সংবাদ থাকে মুরিদের জন্য। কিন্তু উপায় নেই। গোলামকে যে হুকুম তামিল করতেই হয়।

প্রস্তুত হলেন হজরত শামসুদ্দিন তুর্ক। বিদায়ের সময় এলে লক্ষ্য করলেন তিনি, এ কোন্ চেহারা হয়েছে হজরত মখদুমের। শোকের সাগর যেনো উথলে উঠছে হজরতের সমস্ত অবয়ব জুড়ে। ম্লান মুখ। এরকম বিষাদক্লিষ্ট মুখ এর আগে কখনোই দেখেননি তিনি।

হজরত মখদুম আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। নভোগামী সে দৃষ্টির গতি অ-অনুসরণীয়। একসময় মৌনতা ভঙ্গ করলেন হজরত। বললেন, শংকিত হয়ো না শামসুদ্দিন। তোমার উপস্থিতির বরকতেই আল্লাহ্পাক মুসলমান সেনাবাহিনীকে বিজয় দান করবেন। কিন্তু যখন তাদের জয়লাভ হবে, তখনই তাদের এক মুসলমান বন্ধু বিদায় গ্রহণ করবে এই নশ্বর ধরাধাম থেকে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না কোনোদিন।

কী নিদারুণ দুঃসবাদ! পায়ের নিচের মাটি কেঁপে ওঠে। মন বিদ্রোহ করতে গিয়ে আপনা আপনিই নিস্তেজ হয়ে আসে। নিরুপায় মানুষ। কবে কোথায় তুমি ধরে রাখতে পেরেছো তোমার প্রিয়জনকে। যাবার সময় হলে যাওয়াটাই নিয়ম। মন, স্থির হও। মানো। মেনে নাও নিয়তিকে।

কী হবে আফসোস করে। প্রেম-পথের নিয়ম যে এরকমই। হজরত রসুলেপাক স. এর ইন্তেকালের সময় হজরত সিদ্দীকে আকবর রা.কে তাঁর সান্নিধ্য থেকে অন্যত্র গমন করতে হয়েছিলো। চিশতীয়া খান্দানেও তো এই প্রথার প্রচলন

ব্যাপকভাবে। প্রিয়তম খলিফা হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী তাঁর প্রিয় মোর্শেদ হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী র. এর শেষ যাত্রার সময় কাছে থাকতে পারেননি। কাছে থাকতে পারেননি হজরত গঞ্জেশকর র.ও তাঁর পীর মোর্শেদের বিদায়ের দিনে। বাবা গঞ্জেশকর তাঁর অন্তর্ধানের প্রাক্কালে পাশে পাননি অন্তরের অন্তর হজরত মখদুম সাবেরকে। সেই নিয়মই আজ বলবৎ হলো শামসুদ্দিনের উপর। তিনিও কাছে থাকতে পারবেন না প্রিয় মোর্শেদের বিদায়কালে। একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় হজরত মখদুম পান করবেন মিলনের পেয়ালা।

কেঁদে কি হবে? তবু অনেক কাঁদলেন শামসুদ্দিন তুর্ক। অঝোর ধারায় তাঁর চোখ থেকে নেমে এলো শোকের জলবতী নদী।

হজরত মখদুম বললেন, তোমাকে কাছে রাখার বাসনা তো আমিও করি। কিন্তু আল্লাহ্পাকের সিদ্ধান্ত যে অন্যরূপ। তুমি আমি কে বলো? বান্দা আমরা। সহজভাবে মেনে নাও আল্লাহ্পাকের অটুট সিদ্ধান্তকে।

প্রকৃস্থিত হলেন শামসুদ্দিন। আরজ করলেন, হজরত কেবলা এই গোলাম কিভাবে জানবে, কখন চলে গেলেন আপনি?

তুমি অবশ্যই জানতে পারবে, কখন এই ফকির ফানি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। তুমি যখন সেনাবাহিনীতে অবস্থান করবে তখন, একদিন রাতে ঝড় হবে। প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সেনাধ্যক্ষের সুরক্ষিত ছাউনি। সমস্ত বাতি নিভে যাবে একেবারে। শুধু তোমার তাঁবুর অভ্যন্তরের চেরাগ থাকবে অনির্বাণ। সে সময় ঘোর অন্ধকারে শত্রু সৈন্যের আক্রমণের আশংকায় বিচলিত হয়ে পড়বেন সেনাপতি। আলোর সন্ধানে ছুটাছুটি করবেন তিনি। আলোর ইশারা পেয়ে সেনাপতি এসে পড়বেন তোমার তাঁবুর কাছে। তখন তুমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে মগ্ন থাকবে। সে অবস্থায় তোমার বুজর্গি দৃঢ়ভাবে রেখাপাত করবে সেনাপতির মনে। তিনি বুঝতে পারবেন তোমার মর্যাদা। তাঁর দুঃখ দুর্দশা তিনি সম্পূর্ণ খুলে বলবেন তোমার কাছে। তখন তুমি অভয় দিও তাঁকে। পরামর্শ দিও, ঐদিন সুবহে সাদেকের সময়ই তিনি যেনো তাঁর বাহিনী নিয়ে দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইনশাআল্লাহ্ তোমার নির্দেশ পালনের বরকতে সফল হবে মুসলিম বাহিনী। কেল্লা ফতেহ্ হবে।

একটানা বলে গেলেন হজরত মখদুম।

শামসুদ্দিন শুনে গেলেন নীরবে।

হজরত আবার বললেন, কেল্লা ফতেহ্ হওয়ার পর তুমি একবার এসো এখানে। তুমি না আসা পর্যন্ত আমার রূহ্হীন দেহ এখানেই পড়ে থাকবে।

শোকের সঙ্গে যুক্ত হলো বিস্ময়। শামসুদ্দিন প্রশ্ন করলেন, হজরত। আপনার গোসলের এন্তেজাম কে করবেন? কাফনের কাপড় কে আনবেন? কিভাবে কাফনাবৃত করতে হবে আপনার মোবারক শরীরকে?

আমাকে গোসল দেয়ার দায়িত্ব তোমারই। কিন্তু আমার শরীর স্পর্শ করো না যেনো। পানি ঢেলে দিও তফাত থেকে। সেনাপতি তোমাকে কিছু উপহার দেবেন। সে অর্থ থেকে আমার কাফন ও অন্যান্য আনুষংগিক জিনিস কিনে এনো তুমি।

হজরত মখদুম সাবের বলেই চললেন, কাফন প্রস্তুত করবার সঙ্গে সঙ্গে তা আমার শরীরকে আবৃত করে ফেলবে। খসে পড়বে শরীর থেকে পুরাতন লেবাস। সে সময় চোখ বন্ধ করে রেখো তুমি। আমার জানাজা হবে দুইবার। একবার করবে তোমরা প্রকাশ্যভাবে। আর একবার করবে অদৃশ্য জগতের অধিবাসীগণ অদৃশ্যভাবে।

প্রশ্ন করলেন শামসুদ্দিন, আপনার রওজা শরীফ কোথায় হবে হজরত?

হজরত মখদুম বললেন, শামসুদ্দিন বাবা। কফিন হবে আমার দেহ বরাবর। কবরের অবস্থা থাকবে অজ্ঞাত। সুসংবাদ শুনে নাও তুমি। তোমাকে বেলায়েতের জগতের বাদশাহর পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে। তোমার অনুমোদন ব্যতিরেকে আমার সিলসিলায় কেউ অলিআল্লাহ্র পদমর্যাদায় উন্নীত হতে পারবে না।

আবার প্রশ্ন করেন শামসুদ্দিন তুর্ক হজরত! আপনার দাফন সম্পন্ন করবার প্রয়োজন হবে কি?

হজরত মখদুম জানালেন, না।

তবে শরীর মোবারক কায়েম থাকবে কি উপায়ে?

শামসুদ্দিনের প্রশ্নের জবাব দিলেন হজরত মখদুম সাবের, বাবা তুমি চিন্তিত হয়ো না। দু'খানি ছঙ্গে ছুরুখ পাথরের সংস্পর্শে কায়েম থাকবে আমার দেহ। ঐ পাথর দু'খানিতে রয়েছে জান্নাতি নূরের বিচ্ছুরণ। হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র. ঐ পাথর দু'খানি খাজা সৈয়দ ইমামুদ্দিন আবু সালেহ র. এর কবরে রেখে গিয়েছিলেন। আলিমুল্লাহ আবদাল সেখান থেকে পাথর দু'খানি এনে আমার কবরের উপরে রাখবে। একটা পাথর থাকবে আমার মাথার দিকে। আর একটা পায়ের দিকে। তারপর মুখ বরাবর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে আমাকে।

কিছুক্ষণ থেমে আবার বলতে শুরু করলেন হজরত সাবের র., আগেই বলেছি, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে– দুইবার জানাজা হবে আমার। তোমাদের জানাজা আদায়ের পর আর কোনো লোক আসতে পারবে না এখানে। তোমার সিলসিলার সপ্তম স্তরের প্রতিনিধি কলন্দর সর্বপ্রথম আসবে এখানে– সে অনেক যুগ পর। স্মরণ রেখো তুমি, জানাজা আদায়ের পর তিন দিনের বেশী তুমিও এখানে অবস্থান করতে পারবে না।

দীর্ঘ নসিহত শেষ হলো।

এবার বিদায়ের পালা। শেষ বিদায়। চিরদিনের জন্য বিদায়। বিদায় নেন শামসুদ্দিন তুর্ক।

আকাশের চোখে অদৃশ্য অশ্রুধারা। বিচ্ছেদের সাক্ষ্য নিয়ে বয়ে যায় ব্যথাদীর্ণ বাতাস। ডুমুর বৃক্ষের পাতায় দোলে বিদায়ের কলিজা জখম করা কাসিদার কান্না।

কাঁদে কালিয়ার। নিঃশব্দে কাঁদে।